বন্দী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল
“পর্ণ-কুটীর”
৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর

দুই টাকা

প্রিন্টার—শ্রীপরেশনাথ শীল
শীল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

বাংলাদেশের যে-সব ভাই ভ্রাতৃস্নেহে বন্দী,

আমার জানা এবং অজানা

সেই-সব ভাইদের নামে

এই বইখানি

উ ৎ স র্গ

করিলাম।

মূল চিত্রনাট্য হইতে

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দ্বারা উপন্যাসাকারে রচিত

কলকাতা শহরের একপ্রান্তে এক বস্তির মধ্যে এই গল্পের যবনিকা উঠলো। আশেপাশে টিনের চালা আর মেটে ঘর, মাঝখানে সরু একটা পায়ে-চলা পথ। কেউ হয়ত ঘরের দাওয়ায় বসে ভাঙা বেহালা মেরামত করতে ব্যস্ত, কেউ বা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটু রোদ পুইয়ে নিচ্ছে। কেউ ঠেঙোয় ভর দিয়ে ভিক্ষেয় বার হচ্ছে, কেউ বা ফুঁ দিয়ে চেষ্টা করছে উনুন ধরাবার।

কমলা গিয়েছিল কলতলায় জল আনতে। মস্ত একটা বালতি ভর্তি করে জল নিয়ে সে ঢুকলো গোয়াল ঘরে, বালতির জলটা হড় হড় করে গরুর ডাবায় ঢেলে নিঃশ্বাস না ফেলতে ফেলতেই ওদের শোবার ঘরের ভিতর থেকে এলো একটা শব্দ। মনে হল কেউ যেন একটা ঘটী কিম্বা বাটি উল্টে ফেললো। বালতিটা নিয়েই কমলা ছুটলো ঘরের দিকে।

ঘরে এসে দেখে, যা ভেবেছে ঠিক তাই। দুধের বড় বাটিটা উল্টে ফেলে মস্ত একটা বেড়াল চক্‌চক্‌ শব্দ করে দুধ খাচ্চে।

'রোজ রোজ চুরি করে দুধ খাও! দাঁড়াও দুধ খাওয়া তোমার বের করছি!' দড়ি দিয়ে বেড়ালটাকে বেঁধে ফেলতে ফেলতে কমলা বলে, "এইবার মজা দেখাচ্ছি, আর দুধ খাবে?'—

চৌকীর পায়ার সঙ্গে বেড়ালটাকে বেঁধে রেখে কমলা আবার জল আনতে

গেল। কমলাদের ঠিক পাশের বাড়ীর একটা ঘরে শিবনাথ তখন বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। জুতোটা ঝেড়ে মুছে খানিকটা চক্‌চকে করে পায়ে গলিয়ে আলনা থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে দিতেই দেখা গেল পকেটে একটা প্রকাণ্ড ফুটো। ফুটোর ভেতর অনায়াসে একটা হাত ঢুকে যায়। শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'অতুল। এই ছাখ্—'

সামনের ছোট ঘেরা জায়গাটায় শিবনাথের ছোট ভাই অতুল তখন রান্নায় ব্যস্ত; সেখান থেকেই সে জবাব দিলে, 'কি দেখবো কি?'

শিবনাথই এগিয়ে এলো অতুলের কাছে। বললে, 'এই ছাখ্, তোর ইঁদুরের কাণ্ড ছাখ্। আবার কেটেছে।'

—'বেশ করেছে, আচ্ছা করেছে।'

অতুলের কথার ধরণে শিবনাথ হেসে উঠলো। অতুল আবার বললে, 'ইঁদুরের জ্বালায় বেড়াল আনলাম। তাতেও যদি কাটে ত আমি কি করবো! চোরাবাজার থেকে জামা কিনেছ, কাটবে না, কি করবে। সাহেব সেজে ঘুরছ ত খুব। এদিকে আমি ভাত রেঁধে মরছি।'

অতুল কথাটা মিছে বলে নি। রান্না থেকে ঘরঝাঁট দেওয়া, বাজার করা সব ভার অতুলের ওপর। শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কেন সায়েব সেজেছি তা তুই কেমন করে বুঝবি!' কথাটা বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতুল চেঁচিয়ে উঠলো, 'দাদা, ও দাদা—!'

'শিবনাথ বাইরে থেকেই বললে, কি?'

'খেয়ে যাবে না?'

'না, এসে খাব।'

বন্দী

শিবনাথের জুতোর শব্দ বাইরের রাস্তায় মিলিয়ে গেল।

অতুল দেখলে—বেড়ালটা ঘরে নেই।

—গেল কোথায় বেড়ালটা ? পুষি ! পুষি !

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে অতুল একটু এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টি পড়লো কমলাদের ঘরের দিকে। চৌকীর পায়ার সঙ্গে বাঁধা বেড়ালটা অসহায়ভাবে মিউ মিউ করছে। অতুল আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে কমলাদের ঘরে এসে হাজির।

'কে বাঁধলে ? এমন করে কে বাঁধলে বেড়ালটাকে শুনি ?'

কমলা যাচ্ছিল কলসী নিয়ে জল আনতে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিলে, 'কে আবার ! আমি বেঁধেছি।'

'তুমি ? তুমি কে ?' অতুল জিজ্ঞাসা করলে।

প্রতিবেশীদের একজন কমলার কাছে এসেছিল ওদের কোদালটা চাইতে, জবাবটা পাওয়া গেল তার কাছে।

'চেন না ? মহেশের মেয়ে—আমাদের মহেশ।'

'মহেশ কে ?'

'ওই যে দুধ বেচে'—বলে লোকটা চলে যেতে না যেতেই অতুল বললে—'ও, দুধ বেচে ! তা এমনি করে বাঁধতে হয় ? মরে যাবে যে !'

'মরে যাবে ? যাক না !'

কমলা কলসীটা তুলে নিয়ে দুমদাম করে পা ফেলে কলের দিকে যেতে যেতে বলে, 'রোজ রোজ দুধ খাবে চুরি করে, আর আমি ওকে নিয়ে কোলে করে আদর করব, না ?'

'ওরে বাপ ! গয়লার মেয়ের তেজ স্থাখো !'

বন্দী

অতুলের কথাটা কানে যেতেই কমলা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। প্রতিবাদ হিসেবে কিছু বলবার জন্তে দু পা ফিরেও আসে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু না বলেই আবার কলের দিকে এগোয়।

অতুল বেড়ালটার বাঁধন্ খুলে দিয়ে সেটাকে কোলে তুলে নেয়, তারপর যেন কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে, রোজ খাবি, রোজ দুধ খাবি, দুধ না খেলে চলে। দুধ খেয়ে খেয়ে অমনি মোটা হবি।

ঘরে ফিরে বেড়ালটাকে কোল থেকে নামিয়ে অতুল বলে, যা এবার ইঁদুর ধর দেখি একটা। দাদার জামা যদি এবার ইঁদুরে কাটে, তা হলে তুমি মজা দেখবে—

অতুলের সৎপরামর্শের কতটুকু পুষির কানে পৌঁছয় তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু ঠিক সেই সময় ভাতের হাঁড়িটা ধরে গিয়ে পোড়া গন্ধ বেরতেই অতুল একেবারে বিব্রত হয়ে পড়ে। হাঁড়িতে জল ঢালবার জন্তে বালতিটার কাছে ছুটে যেতেই দেখে সেটাও একেবারে শূন্য। বালতিটা নিয়ে অতুল ছোটে কলতলায়।

কলের মুখে জল ভর্ত্তি একটা বালতি বসান, লোকজন কেউ নেই। অতুল বালতিটা সরিয়ে দিয়ে নিজের বালতিটা কলের মুখে বসাতেই পিছন থেকে কমলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

‘কেন সরালে?’

‘না, সরাব না! আমার ভাত পুড়ে যাচ্ছে।’

কমলা অতুলের বালতিটা দেখিয়ে বললে, ‘ছোট বালতি, এইতে ডুবিয়ে নিলে জাত যেত না?’

অতুলের বালতি ইতিমধ্যে ভর্ত্তি হয়ে গেছে! সেটা কলের মুখ থেকে

তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে সে বলে, 'না, যেত না! গয়লা'র ছোঁয়া জল আমি ভাতে ঢালবো! আ-মরি-মরি!'

কমলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে। বালতিটা কলতলাতেই পড়ে থাকে, 'বাবা বাবা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছোটে বাড়ীর দিকে।

মহেশ তখন কোদাল দিয়ে মাটী কোপাতে ব্যস্ত। কমলা প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'বাবা বাবা, তুমি দুধের ব্যবসা তুলে দাও।'

'কেন?'

'সবাই তোমাকে গয়লা ভাবে।'

'ভাবুক। যে যা ভাবে ভাবুক।' মহেশ মেয়ের মুখের দিকে না চেয়েই জবাব দিলেন, 'খেতে যখন পাইনি তখন আমাকে বামুন ভেবে কেউ ত খেতে দেয় নি!'

'তাই বলে আমাদের গয়লা বলবে? এই রইলো জল তোলা, পারবো না আমি তোমার গরুর সেবা করতে।'

রাগে গরগর করতে করতে কমলা ঘরের দিকে এগোয়। মহেশ যেন এতক্ষণে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'কে বললে? কে বললে গয়লা শুনি? তার মাথাটি এই কোদাল দিয়ে আমি টুং করে কেটে ফেলবো। চল্। কোথায় যেতে হবে বল্।'

'বেশী দূর যেতে হবে না। ওই যে ওখানে এসেছে সেই সায়েব বাবু, যে লোকটা তার ভাত রেঁধে দেয় সেই লোকটা।'

'ভাত রাঁধে? রাঁধুনী বামুন?' মহেশ আরও একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

কমলা বললে, 'হ্যাঁ বাবা।'

বন্দী

কোদালটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মহেশ বললেন, 'চল্—দেখি কত বড় বাহাদুর। কোথাকার কে রাঁধুনী বামুন, বলে কি না আমি গয়লা!'

অতুলদের বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে তিনি গর্জ্জন করতে লাগলেন: 'ব্যাটা রাঁধিস তো ভাত, তার আবার মুরোদ কিসের? চলে আয় ব্যাটা চলে আয়, তোর মুণ্ডুটা আমি আজ দুফাঁক করে দেব। তোকে আমি মেরে খুন করে ফেলবো, বেরিয়ে আয়, আয় ব্যাটা বেরিয়ে আয়।'

অতুলও কম যায় না। কথাগুলো কাণে যেতেই রান্না ফেলে, চিমটেটা তুলে নিয়ে উঠে আসতে আসতে বললে, 'দাঁড়া ত দেখি, তোর গয়লার নিকুচি করেছে! এই চিমটের বাড়ী তোর গয়লাকে আমি—'

অতুল বাইরে এসে দাঁড়াতেই মহেশ চীৎকার করে উঠলেন, 'কি বলেছ? তুমি আমার মেয়েকে কি বলেছ? আমরা গয়লা?'

'না গয়লা নয় তো কি? যে দুধ বেচে সে গয়লা নয়?'

মহেশ হাত দিয়ে গলার পৈতেটা দেখিয়ে বললেন, 'না না, গয়লা নয়। এই ছাখো, তুমিও যা আমিও তাই।'

অতুল রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লো, বললে, 'ও, আপনি ব্রাহ্মণ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ব্রাহ্মণ। আমার নাম মহেশ ঘোষাল। দুধের ব্যবসা করলেই গয়লা হয় না।'

অতুল অপ্রস্তুত ভাবে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'অমি জানতাম না। নমস্কার।'

'জানতাম না! জানতে না তো আমার কি হে, আমার কি! এখন তো জানলে? ব্যস্। চল্, কমলা চল্—'

বন্দী

মহেশ এবার বাড়ীমুখো ফিরলেন। পিছু পিছু যেতে যেতে কমলা বললে, ‘ব্যস হয়ে গেল? এই যে মাথা ফাটাচ্ছিলে?’

মহেশ যেতে যেতে জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, ভারি তো একটা রাঁধুনী বামুন। তার আবার—’

অতুল এগিয়ে এসে বললে, ‘রাঁধুনী বামুন, রাঁধুনী বামুন বলবেন না। আমি কিছু বাকী রাখবো না তা হলে।’

মহেশ খিঁচিয়ে উঠলেন, ‘কী তুমি কী? বাবুর ভাত রাঁধো, রাঁধুনী বামুন নও তো কী তুমি হে লাট সাহেব?’

‘বাবু আমার সহোদর ভাই, আমার দাদা, তা জানেন?’

‘ও, জানতাম না।’

‘জানতাম না! এখন তো জানলেন? ব্যাস, চলে যান। নমস্কার।’

অতুল বাড়ীর দিকে ফিরলো। মহেশ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ‘লোকটা ভাল।’

অতুল আবার এদিকে ফিরে বললে, ‘কিন্তু দেখুন—’

‘আবার কি দেখবো?’

‘দেখবেন আপনার ওই মেয়েটি আমার পুষি বেড়ালটাকে যেন অমন করে না বাঁধে, মরে যাবে।’

মহেশ কিছু বলবার আগেই, কমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, ‘না বাঁধবে না। মরলো তো আমার বয়ে গেল!’

মহেশ বাধা দিয়ে বললেন, ‘তুই থাম্।’

‘বেড়ালটা রোজ রোজ দুধ চুরি করে খাবে, আর আমি থামবো?’

‘হ্যাঁ, থামবি, লোকটা ভাল।’

মহেশের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অতুলও বললে, 'হ্যাঁ থামো। উনি লোক চেনেন।' বলেই সে হাসতে হাসতে ঘর মুখো এগোল।

মহেশ মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'লোক চিনে চিনে বুড়ো হয়ে গেলাম। বুঝলি ?' তার পরেই অতুলকে উদ্দেশ করে হাঁক পাড়লেন, 'কিন্তু হ্যাঁ শোনো।'

—'কি শুনবো ? অতুল আবার ঘুরে দাঁড়াল।'

'বেড়াল কেন পুষেছ ? আমার দুধ খাবার জন্যে বেড়াল কেন পুষেছ শুনি ?'

'নাঃ, দুধ খাবার জন্যে তো নয়, ইঁদুর খাবার জন্যে।' অতুল জবাব দিল। মহেশ খুশী হয়ে উঠলেন, কমলার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওই শোন্, ইঁদুর। দুধ নয়, ইঁদুর। তারপর অতুলের একটা হাত ধরে টানতে টানতে বললেন, 'ইঁদুরের কথাই যদি বললে তো শোনো, এসো আমার সঙ্গে।'

অতুল বিব্রত হয়ে পড়লো, বললে, 'না, না, আমার রান্না পুড়ে যাবে।'

'না, না, পুড়বে না ! কম্‌লি দেখে আয়।'

মেয়ের ওপর হুকুম জারী করে মহেশ ইঁদুরের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

'বাবারে বাবা, আমি পারবো না।' বলতে বলতে কমলা এগোল অতুলদের ঘরের দিকে।

মহেশ হাতের কোদালটা ফেলে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'এই শালার বস্তীতে বুঝলে কি না, এই এত বড় বড় ইঁদুর—বেড়ালের মত। কলে পড়ে না, বেড়ালে ধরে না। কাপড় চোপড় কেটে

একেবারে শেষ করে দিলে। মেয়েটার জন্মে একখানা কাপড় এনেছিলাম, দামী কাপড়—'কমলি, অ কমলি, দেখানা কাপড়খানা—'

অতুলদের ঘরের ভিতর থেকে কমলা রাঁধতে রাঁধতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আমি পারবোনা, তুমি দেখাও—'

মহেশ অতুলের দিকে ফিরে হাসি মুখে বললেন, 'ভারি রাগ। আমার মেয়ে কি না। আমারও রাগ ভারি খারাপ।'

'আমারও তাই। দেখলেন না।'

'তবে বামুনে রাগ।'

মহেশের কথা বলার ভঙ্গিতে অতুল হেসে ফেললে।

মহেশ আবার বললেন, 'দপ করে জ্বলে ওঠে—'

অতুল হাসতে হাসতে বল্লে, 'আবার খপ করে নিভে যায়।'

মহেশ হো হো করে হেসে উঠে বলেন, 'ঠিক বলেছ, খপ করে নিভে যায়।'

এরপর মহেশ বোধ হয় নিজের গোয়ালের দিকেই ফিরতেন, কিন্তু তার আগেই আবির্ভাব হোলো পণ্ডিতের। হাতে দাবার ছক্ আর বাক্স। মহেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'এই যে পণ্ডিত, এসো, এসো। বাঃ বাঃ, বেশ ফ্যাসান করে চুল ছেঁটেছ যে!'

'মানে ও আমি কি ছেঁটেছি, নাপিত ছেঁটেছে, দু-আনা পয়সা নিয়েছে।'

'হাতে কি দাবার ছক্? চলো তাহলে ঘরে গিয়ে এক হাত বসা যাক্।'

'পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ নিজের ঘরের দিকে এগোলেন।'

বন্দী

অতুল বললে, 'আমি তা হলে চলি, ওদিকে আবার—'

মহেশ বাধা দিয়ে বলেন, 'সে কি! দেখবে চলো, ভারি মজার খেলা। আসে-তৌ?'

'তা একটু আধটু সবই আসে।' অতুল হাসতে হাসতে জবাব দিল।

'তবে আর কি! তুমিই আগে এক হাত বসে যাও পণ্ডিতের সঙ্গে। আমি একটু তামাকের জোগাড় দেখি—'

মহেশের ঘরের দাওয়ায় দাবার ছক্ পড়লো। তারপর সময় যে কোন দিক দিয়ে কাটতে লাগলো সে খেয়াল রইল না কারও।

কয়েক জায়গায় চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বাড়ী ফিরেই শিবনাথ হাঁকলে, 'অতুল ভাত দে।'

শিবনাথের গলার স্বর কানে যেতেই বিব্রত কমলা তাড়াতাড়ি ভাত তরকারী থালায় গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার চেষ্টা করলো।

আবার শিবনাথের ডাক শোনা গেল: 'অতুল!'

কমলা কি যে করবে ঠিক করতে পারে না। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল গড়িয়ে থালার পাশে রেখে সরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু শিবনাথ তার আগেই একেবারে রান্নার জায়গাটায় এসে হাজির!

অতুলের বদলে কমলাকে দেখে শিবনাথও একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কমলা জড়সড় হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই শিবনাথ আবার হাঁক পাড়লে, 'অতুল!'

কিন্তু অতুলের সাড়া পাওয়া গেল না। শিবনাথ রীতিমত বিরক্ত হয়ে আবার ডাকাডাকি সুরু করলো।

শিবনাথের ডাক কানে যেতেই দাবা খেলার চালগুলো অতুলের

মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে খেলা ফেলে উঠে পড়লো, ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'ভাত যে দেব একটু দেরী করে আসতে পারলে না। এদিকে—'

হঠাৎ উনুনের পাশে থালার ওপর সাজানো ভাত তরকারী চোখে পড়তেই অতুল আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'বাঃ বাঃ, সব ঠিক করে রেখে গেছে। বলিহারী মেয়ে। এইত চাই। বসে পড় দাদা, বসে পড়!'

শিবনাথ ভাতের থালা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, 'মেয়েটি কে?'

'মেয়েটি? ও হ্যাঁ, এই যে—এই যে পাশেই থাকে, ওই যে দুধ বিক্রী করে তার মেয়ে।'

'দুধ বিক্রী করে—গয়লার মেয়ে?'

'গয়লার মেয়ে? দুধ বিক্রী করলেই গয়লা হয় না।' খানিক চুপ করে থেকে অতুল জিজ্ঞাসা করে, 'দেখলে? দেখলে মেয়েটাকে?'

'হুঁ, দেখলাম।' ভাত ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শিবনাথ জবাব দেয়।

অতুল এবার শিবনাথের কাছাকাছি বসে পড়ে বলে, গয়লার মেয়ে নয়, বামুনের মেয়ে। ওর বাপ দুধ বিক্রী করে কি না, তাই আমি ভেবেছিলাম গয়লা। কিন্তু গয়লা নয়—বামুন।

'তা বামুন হলো তো তোর কি?'

'আমার কি! আমার কচু!'

'কচু তো এসেছিল কেন? ডেকেছিলি বুঝি?'

'ডাকব কেন? অত বড় মেয়ে ডাকলে আসে! এমনিই এসেছে!' অতুল যেন একটু বিব্রত হয়েই শিবনাথের পাশ থেকে উঠে পড়লো।

শিবনাথ বললে, 'হ্যাঁ, এমনি এসেছে! আচ্ছা দাঁড়া, ওকে আমি জিজ্ঞাসা করবো।'

মহেশ আর পণ্ডিতের দাবা খেলাটা সবে জমে উঠেছে, হাতে নুনের একটা ভাঁড় নিয়ে কমলা এসে বল্লে, 'বাবা, এইটি একবার দিয়ে এসো।'

দাবার ছক্ থেকে মুখ না তুলেই মহেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়?'

'ওই যে এক জঞ্জাল জোটালে। একটা নমস্কার করেছে আর গলে জল হয়ে গেলে। চট্ করে এই নুনটুকু দিয়ে এসো।'

'নুন! কেন?'

'তরকারীতে নুন দিতে ভুলে গেছি।'

'ও! তা বেশ করেছিস, নুন মাখিয়ে নিয়ে খাবে। মহেশ বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে নুনের পাত্রটা কমলার হাত থেকে নিয়ে নিজের পাশটীতে নামিয়ে রেখে দাবার ছকের দিকে চেয়ে বললেন, 'পণ্ডিত চুরি করো না। তোমার নৌকো এবার ডুবলো।'

'তোমার ঘোড়াও এইবার বেড়া ডিঙ্গোলো।'

মহেশের ওঠবার লক্ষণ নেই দেখে কমলা আর একবার তাগাদা দেয়; 'বাবা—'

মহেশ বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, 'আঃ—'

অগত্যা কমলা নুনের পাত্রটা তুলে নিয়ে নিজেই যাবার জন্য তৈরী হয়।

শিবনাথ এদিকে ভাতের সঙ্গে তরকারী মুখে দিয়েই অতুলকে ধমকাতে সুরু করেছে।

'এ কী রান্না হয়েছে, অতুল? তরকারীতে একদম নুন দিস নি? কোন্ দিকে মন ছিল?'

বন্দী

'নুন! দিচ্ছি, দাঁড়াও!' অতুল তাড়াতাড়ি নুনের ভাঁড়টার কাছে গিয়ে দেখে এক তিল নুন নেই সেটার মধ্যে।

'আরে নুন যে একেবারে নেই। বসে বসে খাও, চট্ করে নিয়ে আসি দোকান থেকে। পয়সা কোথায় আছে, পয়সা?'

শিবনাথের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই অতুল নুনের ভাঁড়টা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবনাথ রাগে অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দোকান থেকে আন্‌বি? সময়ে এনে রাখতে পার না? মাথাটা গেল নাকি খারাপ হয়ে।'

আর একটা তরকারী মুখে দিতে গিয়ে শিবনাথ আরও বিরক্ত হয়ে উঠলো।

'দ্যাৎ তেরি, এটাও তাই!—নাঃ খাওয়া হলো না—দূর্! দূর্! ছি ছি ছি,—পাতের তরকারীগুলো শিবনাথ ছুড়ে ফেলে দেয়। ঠিক সেই সময় নুনের পাত্রটা নিয়ে কমলা ঢুকছিল ঘরে, তরকারীগুলোর কতকটা পডলো গিয়ে একেবারে কমলার গায়ে। এদিকে দাদার পকেটে পয়সা না পেয়ে অতুলও ততক্ষণে ফিরে এসেছে। কমলার হাতের পাত্রটা দেখে সে বলে, 'ওটা কি?'

'নুন।'

পাত্রটা অতুলের সামনে বসিয়ে রেখে কমলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতুল পাত্রটা তুলে নিয়ে শিবনাথকে নুন দিতে দিতে বললে, 'এই নাও, আমায় আর যেতে হলো না। কিন্তু দাদা, মাথা আমার খারাপ হয়েছে না তোমার? তরকারীটা একেবারে ওর গায়ে ছুড়ে মারলে?'

ব্যাপারটার জন্যে শিবনাথ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, অবশিষ্ট

তরকারীর সঙ্গে নুন মাখতে মাখতে বললে, 'ভারি অন্যায় হয়ে গেল। দেখা হলে বলে দিস, আমি দেখতে পাইনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবেখন। তুমি—'

শিবনাথ একগ্রাস ভাত মুখে তুলে বললে, 'মেয়েটী বেশতো। কি নাম রে?'

অল বলতুেল, 'কমলা।'

নুনের পাত্রটা সরিয়ে রেখে, কিছুক্ষণ সে হাসিমুখে শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললে, 'দাদা— তোমাকে একটা কথা বলবো শুনবে?'

'কি কথা?'

'রাঁধতে আমার আর ভাল লাগছে না দাদা।'

শিবনাথ মুখখানা গম্ভীর করে বললে, 'হুঁ, বুঝতে পেরেছি। কি করতে হবে? রাঁধুনী রাখতে হবে?'

'রাঁধুনী? হুঁ তাই, তাই। যা বলবে বল। বাড়ীতে একটা মেয়ে মানুষ আসুক, আমি রান্না থেকে রেহাই পাই।'

'তা কত মাইনে দিতে হবে?'

অতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে?'

'ওই মেয়েটীকে।'

'বাঃ, বাঃ! মাইনে দিলেই ও থাকবে কি না! ভদ্রলোকের মেয়ের একটা মানসম্ভ্রম নেই?'

'তা হলে কি করতে হবে তাই বল্?'

'কি আর করতে হবে, ওই মেয়েটীকে তুমি বিয়ে কর দাদা। বাড়ীটা

তবু বাড়ী বলে মনে হোক। (তরকারীটা তুমি ফেলে দিলে দাদা, দাঁড়াও আর একটু এনে দিই।')

('না, না, কিছু আনতে হবে না।' একটু চুপ করে থেকে শিবনাথ বল্লে,) 'কিন্তু হ্যাঁরে হতভাগা, বাস্তুর ও মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে ?'

'কেন মেয়েটা কি খারাপ ?'

'তা না হোক, তুই থাম্। এঁচোরে পেকে একেবারে ইয়ে হয়ে গিয়েছিস দেখছি। হতভাগা কোথাকার !'

শিবনাথ অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে পর পর কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পুরে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে ফেললে। অতুল কিছুক্ষণ বিমর্ষমুখে বসে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'বিয়ে তা হলে তুমি করবে না ?'

'না !'

'বাড়ীতে একটা মেয়েছেলে আসবে না ?'

'না।'

অতুল যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না, একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, 'সত্যি বলছো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'তা হলে আমিই তোমার ভাত রাঁধব চিরকাল ?'

না, রাঁধবে না, লেখাপড়া শিখে একেবারে পণ্ডিত হয়েছ, আপিসে বসে বসে কলম চালাবে ? ভাত রাঁধবে না। চুপ কর্ হতভাগা, চুপ কর্।'

'তুমি আমাকে অমন করে বকো না বলছি।'

'না, বকবে না !'

অতুল এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, 'তা হলে কি বলতে চাও—মা মরে গিয়ে তোমার কাছে আমায় রেখে গেল—চিরকাল তোমার ভাত রাঁধবার জন্যে ?'

অতুলের কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভিতরের উচ্ছ্বসিত কান্নাটাকে ও কোন রকমে চেপে রেখেছে। কথাটা বলতে বলতেই সে সরে যাবার চেষ্টা করলো।

শিবনাথ চীৎকার করে ডাকলে, 'অতুল !'

ফিরে দাঁড়িয়ে অতুল বললে, 'কি ?'

শিবনাথ ওর মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বললে, 'কাঁদছিস ?'

'না কাঁদিনি।' অতুল তাড়াতাড়ি রান্নার জায়গাটায় গিয়ে বসলো।

'অমন করে কাঁদিসনি বলছি, ভাল কাজ হবে না, ভাতের থালা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাব।'

উনুন থেকে অকারণে একটা আধপোড়া কাঠ টেনে বার করতে করতে অতুল বললে, 'কই দাও দেখি—দেখি কেমন বাহাদুর। খবরদার বলছি, না খেয়ে উঠবে না, তাহলে আমি কিছু আর বাকী রাখব না বলে দিচ্ছি।'

কাঠের টুকরোটা উনুনের ভেতর গুজে দিতে দিতে অতুল আবার বললে, 'দূর তেরি ধোঁয়ার নিকুচি করেছে। দিলে একেবারে চোখ মুখ জলে ভাসিয়ে! কাঁদিয়ে দিলে। দিলে কাঁদিয়ে।'

দাদার কাছে ধমকানি খাবার পর অতুল মনে মনে স্থির করে ফেললে যে কমলাদের সঙ্গে মেলা মেশাটা তার বন্ধ করতে হবে। আর এই

বন্দী

সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করবার জন্যেই সে এবাড়ী আর ওবাড়ীর মধ্যে যে ভাঙ্গা দেওয়ালটা যোগসূত্র রক্ষা করে আসছিল সেটা দিয়ে যাতায়াতের পথটুকু বন্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কোথা থেকে এক রাশ ভাঙ্গা কাঠ, বাখারী আর দড়ি জোগাড় করে পথটা সে বন্ধ ত করে দিল আর মনে মনে বললো, কাজ কি বাবা আমার এত সব গণ্ডগোলে। আবার কে কখন কি দেখে ফেলবে, তখন আর কেলেঙ্কারীর কিছু বাকী থাকবে না। ভাত রাঁধছি, চিরকাল ভাতই রাঁধি। দাদা তো নয়—শত্রু—শত্রু—

বেড়া দিয়ে অতুল এসে বসলো উনুনের কাছে। কিন্তু মনটা ভারি খারাপ। সত্যিই যেন এসব আর ভাল লাগে না। কিন্তু না করেই বা উপায় কি? বাপ মা মারা যাবার পর ওদের চলে আসতে হয়েছে শহরে, দেশে মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁই ছিল না। দাদা তো সকাল-সন্ধ্যে চাকরীর চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কিছু একটা জুটছেও না যে……

কলতলা থেকে জল নিয়ে ফিরতে ফিরতে কমলা থমকে দাঁড়াল ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁকে অতুলের দেওয়া সেই বেড়াটা দেখে, হাসিও পেল। উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িটা চড় চড় করছে, পোড়া গন্ধও বেরুচ্ছে, কিন্তু অতুলের সে দিকে খেয়াল নেই…

'গেল যে!' কমলা সেই বেড়ার ধার থেকেই বলে উঠলো।

অতুল চমকে উঠে বললো, 'উঁ!'

'ভাত পুড়ে গেল যে!'

'পুড়ুক। আমাকে আর রান্না দেখাতে হবে না। আমি বলে পাকা রাঁধুনী, উনি এসেন আমাকে রান্না শেখাতে।'

বন্দী

অতুল উনুনের উপর থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি ফেন গালবার চেষ্টা করতেই হাঁড়ির মুখের শরাটা সরে গিয়ে গরম ফেন পড়লো অতুলের হাতের ওপর।

অতুল যন্ত্রণায় অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করতেই পিছন থেকে কমলা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

'কেমন পাকা রাঁধুনীর হাত পুড়লো ত?'

'পুড়ুক, পুড়লো আমার পুড়লো। তোমার তাতে কি? উঃ বাবারে বাবা—"

কমলা হাসি থামিয়ে বললে, দাঁড়াও, 'আসছি—'

বলেই ছুটলো বাড়ীর দিকে।

কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে অতুল বললে, 'এসো। না, না, এসো না। উঃ!'

জ্বালায় অস্থির হয়ে হাতটায় সে ফুঁ দিতে আরম্ভ করলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কমলা ফিরে এল। হাতে একটা ওষুধের শিশি। অতুলের অনেক পরিশ্রমের বেড়াটা দুই হাতে ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলে রান্নার জায়গাটায় ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'ছেঁড়া কাপড় আছে?'

'তুমি আবার এলে? ওটা কি?'

কমলা এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বললে, 'কিছু নয়।'

তারপর হাতের শিশিটা নামিয়ে রেখে ঢুকলো অতুলদের শোবার ঘরে।

অতুল বললে, 'এতো আচ্ছা মেয়েরে বাবা! বললে কথা শোনে না!'

কমলা ততক্ষণে ওঘরে গিয়ে একটা কাপড় নিয়ে ছিঁড়তে সুরু করেছে।

বন্দী

'আহা হা হা, ওকি করছ ?'

কমলা নির্বিকার ভাবে কাপড়টা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, 'কি হলো ?'

'ওটা যে আমার পরবার কাপড়।'

'ব্যাটাছেলের ছেঁড়া কাপড় পরতে নেই।'

কাপড়ের একটা টুক্‌রো নিয়ে অতুলের কাছে ফিরে এসে কমলা বললে, 'কেন ?'

'বড়লোক ভাই, কাপড় একটা কিনে দিতে পারে না ?—দিন। দেখি হাতটা।'

বিব্রত অতুল কি করবে ঠিক করতে পারে না, কোন রকমে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

কমলা শিশি থেকে হাতের পোড়া জায়গাটায় ওষুধ ঢালতে ঢালতে বললে, 'দাদাটি কি সহোদর ভাই না আর কেউ ?'

অতুল হঠাৎ যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। 'তোমার অত সব খবরে দরকার কি ঠাকরুণ, তুমি যাও, এ আমি বেঁধে নিতে পারবো।'

কমলা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে রইলো, তারপর বললে, 'বেশ তবে বাঁধুন, আমি চললাম। মানুষের উপকার করতে নেই—'

কমলা বেরিয়ে গেল সেখান থেকে—বেশী দূর গেল না, অতুল কি করে আড়ালে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলো। অতুল ন্যাকড়ার টুক্‌রোটা নিয়ে বার দুই পোড়া জায়গাটা বাঁধবার চেষ্টা করলো, পারলে না, তারপর বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো—'ধ্যেৎ তেরি আমার দ্বারা এ সব কাজ হবে কেন ?'

কমলা হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললে,—'রাঁধুনী বামুনকে দিয়ে এসব কাজ হয় না, দিন।'

বন্দী

অতুল ন্যাকড়াটা কমলার হাতে দিতে দিতে বললো, 'নাও, নিয়ে বিদেয় হও। ফট্ করে কে কখন কি বলে দেবে, তখন আর আমার সহ্য হবে না, একটা হুলস্থূল কাণ্ড করে ফেলবো।'

কমলা অতুলের কথাব জবাব না দিয়ে ওর হাতটা বাঁধতে লাগলো। অতুল কতকটা যেন নিজের মনেই বললে, 'দরকার কি বাবা, ভাত বাঁধতে এসেছি, ভাতই রাঁধি। দাদাকে এতবার বললাম।'

—'কি বললেন ?'

—'বললাম—বিয়ে কর।'

কমলা আরক্ত মুখে বলে উঠলো, 'যাও।'

অতুল বললে, 'যাও মানে ? দাদা কি আমার যে সে লোক মনে করেছ ? তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে—'

কমলা কিছু বলবার আগেই বাইরে জুতার শব্দ হলো। অতুল বলে উঠলো, 'ওই দাদা আসছে—'

কমলা তাড়াতাড়ি কাপড়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পালালো সেখান থেকে।

শিবনাথ ঘরে ঢুকে মিনিট খানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর বললে, 'মেয়েটি আবার এসেছিল ?'

অতুল গম্ভীর ভাবে বললে, 'হুঁ।'

—'আবার ডেকেছিলি ?'

—'তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না, চুপ করো।'

অতুল মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শিবনাথ একটু চুপ করে রইলো, অতুল যে কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেটুকু

বুঝতে তার দেরী হোলো না, সে বল্লল, 'রাগ করেছিস? আচ্ছা ভাত দে'—একথা বলেই তার চোখ পড়লো অতুলের ন্যাকড়া জড়ানো হাতের উপড়।

—'ও কিরে? হাতে কি হলো?'

—'কিছু হয়নি। ভাত তুমি নিজে বেড়ে নাও, আমি পারবো না।'

অতুল আরও খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শিবনাথ বললে, 'হাত পুড়িয়েছিস?'

—'হু।'

—'বাঃ!'

শিবনাথ হাসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসিটা নিজের কাছেই তার বিশ্রী লাগলো। এই ছোট ভাইটিকে তার জন্যে দু'-বেলা রাঁধতে হয়, কোনদিন সে তার জন্যে অনুযোগ করে না। শিবনাথ এজন্যে বরাবরই একটা লজ্জা বোধ করে মনে মনে। কিন্তু অন্য কোন উপায় নেই বলে দেখেও যেন কিছুই দেখে না। আজ কিন্তু সত্যি তার কষ্ট হলো। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কোট প্যাণ্টটা ছেড়ে এসে সে দেখলো অতুল তখনও ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শিবনাথ তার কাছে এসে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আর হাত পোড়াতে হবে না। ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেই বুঝলি? তুই ওকে বিয়ে কর।'

অতুল ভাবলে দাদা তাকে ঠাট্টা করছে, সে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে বলে উঠলো, 'খুব হয়েছে, থামো। আমাকে আর অত ভালবাসতে হবে না।'

শিবনাথ একটু অবাক হয়ে বললে, 'বারে!'

বন্দী

অতুল শিবনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব বাহাদুর! আমার ঘাড়ে একটি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াও। তুমি আমার শত্রু ছিলে আর জন্মে, আমি জানি তুমি আমার শত্রু ছিলে—'

বলতে বলতে সে ঢুকলো গিয়ে ঘরের মধ্যে।

শিবনাথ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'তা হলে কি আমাকেই বিয়ে করতে হবে?'

অতুল সেইখান থেকেই বলে উঠলো, 'কর না কর, আমি আর কিছু বলবো না। আমি এইবার পালাব কোন্ দিকে তুমি দেখে নিও—'

খুব রাগের স্বরেই কথাগুলো অতুল বললো বটে, কিন্তু তার অবস্থা দেখে মনে হলো এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

শিবনাথ আগেই মনস্থির করে ফেলেছিল, বললে, 'থাক, থাক, আর পালিয়ে কাজ নেই তোর। আমিই বিয়ে করবো।'

অতুল আশ্চর্য্য হয়ে তাকালো শিবনাথের মুখের দিকে। প্রথমটা মনে হোলো শুনতে তার ভুল হয়েছে। তারপর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যি বলছো?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়লে।

অতুলের তবু যেন বিশ্বাস হোলো না, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যি বলছো দাদা?'

শিবনাথ বললে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ।'

অতুল আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলো, ভুলে গেল তার পোড়া হাতের জ্বালা-যন্ত্রণা।

বললে, 'বাস্ বাস্—আর কিছু আমি শুনতে চাই না।'

কোমরের কাপড়টা ভাল করে বাঁধতে বাঁধতে সে ছুটলো বাইরের দিকে।

শিবনাথ বললে, 'আরে যাচ্ছিস কোথায়? বিয়ে কি এক্ষুনি নাকি? আরে শোন্, শোন্—'

কিন্তু শুনবে কে? অতুল ততক্ষণে মহেশ ঘোষালের চালার সামনে গিয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে।

—'ঘোষাল! ও ঘোষাল মশাই!'

অতুলের ডাক শুনে মহেশ দাওয়ায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'কি? ব্যপার কি?'

অতুল বেশ মুরুব্বীর মত দাওয়ায় বসে পড়ে বললে, 'মেয়েটাকে যে ধিঙ্গি বুড়ো করে রেখেছ, বিয়ে দেবে না?'

ঘোষাল কথাটার মানে করলেন অন্য রকম, চট্ করে মাথার রক্ত তাঁর গরম হয়ে উঠলো, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'বিয়ে? দু-দিন তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেছে আর এমনি বিয়ে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। আর যদি তোমার ওদিকে যায় তো ওকে আমি কেটে ফেলবো। কমলি, কমলি!'

ঘোষাল বোধ হয় কমলির খোঁজেই যাচ্ছিলেন, অতুল বললে, 'আঃ আমি নই ঘোষাল, আমি নই। আমার চেয়ে ভাল পাত্র তোমায় ঠিক করে দিলাম। সত্যি বলছি ঘোষাল, তোমার কপাল ভাল, বি-এ পাশ, অনেক টাকা রোজগার করে—'

ঘোষাল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও একটু স্থির হয়ে বললেন, 'কে?'

বন্দী

অতুল একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললে, 'বলত কে ?'

—'তোমার দাদা ?'

অতুলের মুখ হাঁসিতে ছেয়ে গেল, বললে, 'ঠিক ধরেছ ত ?'

মহেশ কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন, উঁহু, উঁহু, তোমার দাদা, তোমার সঙ্গে ইয়াকি করেছে।'

অতুল রেগে উঠলো, বললে, 'দেখো ঘোষাল, মুখ সামলে কথা বোলো। দাদা ভাইয়ে ইয়াকি তোমরা কর গিয়ে, আমি ওসব ইয়াকি টিয়াকিব ধার ধারি না। নাও, বসো, কত টাকা খরচ করতে পারবে বল।'

মহেশ বললেন, 'টাকা তো খরচ করতে পারবো না, টাকা নেই।'

অতুল বিশ্বাস করলে না, বললে, 'আলবৎ আছে। এতকাল দুধে জল ঢাললে আব টাকা নেই ? আমি পুরুত ডাকি, তুমি দিন ঠিক করে ফেল— কথাটা বলেই অতুল বেরিয়ে গেল।'

পুরুত শেষ পর্য্যন্ত ডাকতে হোলোনা, পণ্ডিতই পাঁজী দেখে দিন স্থির করে দিলেন। তারপর সুরু হোলো খরচ পত্তরেব ফর্দ্দ তৈবীর পালা। পণ্ডিত মহেশের দলে, খরচটা যথা সম্ভব কম করতে পারলেই বাঁচেন, কিন্তু অতুল তাতে খুসী হতে পারে না। আর কেউ নেই, তার একটি মাত্র দাদা, আজ বাদে কাল মস্ত চাকরী করবে, তার বিয়ে কখনও নমোনমঃ করে সারা যায়। কিন্তু মহেশ বলেছেন তাঁর হাতে টাকা-কড়ি কিছুই নেই, কাজেই সেও খরচের অঙ্কটা যথাসম্ভব কমাবার চেষ্টাই করে।

হুঁকোয় একটা টান দিয়ে অতুল পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলে, ফুল কত পয়সে?

'চার পয়সা।'

'ধ্যেৎ তেরি ! খুব পুরুত তুমি ! চার পয়সার ফুল ! চার পয়সার

ফুল দিয়ে তোমার শ্রাদ্ধ করা যায়—তা'জানো! ধর—দুপয়সা। নাও যোগ করো—কত হোলো দেখ।'

পণ্ডিত খুচরো খরচের অঙ্কগুলো যোগ করে ফেলে বললে, 'এইবার তা হলে একটা খাওয়ার ফর্দ্দ করি।'

অতুল হতাশ ভাবে বলে উঠলো, 'তুমি ডোবালে পণ্ডিত, তুমি ডোবালে। ওই যে ধরা হোলো আড়াই সের ময়দা, তুমি খাবে, আমি খাব, ঘোষাল খাবে, বর খাবে, ক'নে খাবে—বাস্, আবার কি! শুনছো ঘোষাল, বলেছ টাকা নেই—'

টাকা নেই সে কথা পণ্ডিতও জানে। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে হাত ছোট করতে ব্রাহ্মণ মানুষের বাধে। তাই পণ্ডিত বলে, 'হাজার হোক একটা মেয়ের বিয়ে। নেমন্তন্ন খাওয়াবে না? দু' চার জন বাইরের লোক! কি বল ঘোষাল?'

—'ঘোষাল কি বলবে?' অতুল বাধা দিয়ে বলে উঠলো—আমি বরকর্ত্তা, আমি বলছি, দেশ দুনিয়া নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ক্ষমতা ঘোষালের নেই। বিয়েটা তুমি হতে দেবে না পণ্ডিত, তুমি ওঠো—আমি অন্য পুরুত ডাকি।'

পণ্ডিত অপ্রস্তুত হয়ে ঘোষালের মুখের দিকে চাইলো, ঘোষাল বললেন, 'অতুল ঠিক বলেছে পণ্ডিত, এখনও মাসকাবার হয়নি দুধের টাকাকড়ি যেখানে যা পাব, সব বাকী।'

অতুল বললে, 'বাস্, বাস্, আর তোমায় বলতে হবে না, আমি সব জানি। তাও, মোটমাট কত হলো তাই বলো।'

পণ্ডিত ফর্দ্দটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'হলো তেইশ টাকা বার আনা।'

অতুল এবার ঘোষালের দিকে চাইলো।

—'তোমার হাতে কত আছে ঘোষাল?'

—'পঁচিশ।'

—'বাস। কাল বিয়ে। দাও, সেই যে সাতটা টাকা আন্‌লে দাও, কাপড় কিনে আনি।'

ঘোষাল ফতুয়ার পকেট থেকে সাতটি টাকা বার করে দিলেন অতুলের হাতে। অতুল পণ্ডিতের দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি কাপড় চোপড় পাবে না পণ্ডিত, তখন যেন গোলমাল কোরো না, চার-আনা দক্ষিণে ধরে দিয়েছি—বাস্।' পণ্ডিত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, বললে, 'কিন্তু…'

—'কিন্তু-টিন্তু ছে:ড় দাও পণ্ডিত। খাব খাব করে বিয়েটা ত দিয়েছিলে এখুনি মাটী করে। তোমার কি ইচ্ছে সারা বস্তীকে বস্তী নেমন্তন্ন করে বেচারা বিপদে পড়ুক।'

পণ্ডিত আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, 'না, না, তা বলিনি। বলছিলাম—'

—'বলছিলে—তোমার জানাশুনো বন্ধুবান্ধব, পাওনাদার, যজমান—আমি কি আর বুঝতে পারি না ভেবেছ?'

হুঁকোটা দেয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে অতুল উঠে দাঁড়াল। তারপর মহেশের দিকে চেয়ে বললে, 'পণ্ডিত বড় সহজ লোক নয় ঘোষাল, ওকে সামলাও, আমি আসছি—'

ঘোষালের ওখান থেকে এসে অতুল নিজেদের ঘরে ঢুকলো। শিবনাথ তখন সিগারেট ধরিয়ে বেরবার উপক্রম করছে।

অতুল বললে, 'দাদা, পেণ্টুলুনে হবে না, লুঙ্গি পরেও হবে না, ধুতি-টুতি তোমার আছে? ভাল ধুতি?'

বন্দী

শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে বললে, 'তুই কি সত্যিই আমার বিয়ের ঠিক করে ফেললি নাকি?'

অতুল ক্ষুণ্ণভাবে বললে, 'তোমার মত আমি মিছে কথা বলি না দাদা। বল ধুতি আছে কি না?'

—'আছে।'

—'ভাল?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল।'

অতুলের যেন একটা মস্ত দুর্ভাবনা ঘুচে গেল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, 'যাক, দুটো টাকা বাঁচলো!'

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শিবনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানেই। নানা জায়গায় চেষ্টা করেও সে এতদিনে একটা চাকরী জোগাড় করতে পারেনি। তার ওপর বিয়ে! কিন্তু উপায় বা কি! মা মারা যাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই অতুলই দুবেলা হাত পুড়িয়ে রেঁধেছে, অসুখে বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করেছে, তাই বলে চিরকাল কি এই সবই সে করে যাবে? অতুলের আনন্দ উদ্ভাসিত মুখখানা শিবনাথের মনে পড়লো। বিয়ের কথা হবার পর থেকে তার যেন আর কোন চিন্তা নেই।···না, শিবনাথ মনে মনে বললো, এ বিয়েতে আপত্তি করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

অতুল বেরিয়েছিলো মহেশের দেওয়া সেই সাতটা টাকা নিয়ে কাপড় চোপড় কিনতে। বেরতেই গলির মুখে দেখা চাঁপার সঙ্গে। চাঁপা এই বস্তীরই মেয়ে। মেরা সিনওয়ালী। রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে পয়সা রোজগাড় করে, সঙ্গী আছে একটি। চাঁপার সঙ্গে দেখা হতেই অতুল বললে,

'এই ছুঁড়ি, কাল সন্ধ্যাবেলা আমার দাদার বিয়ে। থাকিস যেন—গান গাইতে হবে।'

চাঁপা কিছু বলবার আগেই অতুল তার সঙ্গীটার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই সানাই বাজাতে পারিস?'

চাঁপা বললে, 'পারে—পারে, খুব পারে।'

অতুল বললে, 'কাল বাজাতে হবে কিন্তু।'

চাঁপা বললে, 'বাজাবে।'

অতুল খুশী হয়ে এগোচ্ছিল, মেয়েটা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'ও দাদাবাবু, শোনো, শোনো। কার সঙ্গে বিয়ে গো? কোথায় বিয়ে হবে?

—'এইখানে, এইখানে। ঘোষালের মেয়ে—কমলি।...না, কমলি আর বলবো না, আমার বৌঠাকরুণ!'

চাঁপা খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠলো।

—'বা বা বা, আমাদের কমলি দিদি? খাওয়াবে তো?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়াব, নিশ্চই খাওয়াব।'

অতুল আবার একটু এগোল। ওদিক থেকে আসছিল ভাল্লুকওয়ালা—এই বস্তীরই বাসিন্দে, ভাল্লুক নাচ দেখিয়ে পয়সা উপায় করে। অতুল তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই ব্যাটা ভাল্লুকওয়ালা, কাল আমার দাদার বিয়ে। যাবি সন্ধ্যে বেলা।'

এমনি করে বাঁদরওলা, ঘুগনিওলা, রিপুকর্ম্মওয়ালা...আর কত লোককে যে অতুল যেতে যেতে তার দাদার বিয়ের খবরটা জানিয়ে দিল, তার কোন ঠিক ঠিকানা রইলো না। ভিখিরীর দলগুলো পর্য্যন্ত বাদ পড়লো না।

সবাই বললে, 'যাবো তো বাবু?'

অতুলও সবাইকে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবি বইকি। খুব খাবি। খুব স্ফূর্ত্তি করবি বুঝলি ?'

মিনিট দশেকের মধ্যে অত বড় বস্তীর কারও জানতে বাকী রইলো না যে কাল মহেশ ঘোষালের মেয়ে কমলির সঙ্গে অতুলের দাদার বিয়ে। আর অতুলেরও মনে রইলো না যে এ বিয়েয় মহেশ ঘোষালের বরাদ্দ মোট পঁচিশটা টাকা এবং একটু আগে সে নিজেই খরচ কমাবার জন্তে পণ্ডিতের সঙ্গে রীতিমত কথা কাটাকাটি করে এসেছে !

বিয়ের রাত্রের ব্যাপার দেখে মহেশ ঘোষালের চক্ষুস্থির ! একেরপর এক লোক আসছে তো আসছেই ! অতুলকে তিনি যতই জিজ্ঞাসা করেন ততই সে মুখ টিপে টিপে হাসে। শেষ পর্য্যন্ত উত্যক্ত হয়ে তিনি মান বাঁচাবার জন্তে ছুটলেন মুদীর দোকানে, নিয়ে এলেন আরও কিছু ঘি আর ময়দা।

রান্নাবান্নার চার্জ্জ অতুল নিজেই নিয়েছিল—ময়দা মাখা থেকে লুচি বেলা পর্য্যন্ত সব। মহেশ ময়দার থলে আর ঘিয়ের টিনটা সশব্দে নামিয়ে রেখে, মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করে রান্নার জায়গায় বসে পড়লেন।

অতুল একটু চুপ করে থেকে তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করলে, তারপর বললে, 'বলি, ও মহেশ—'

অতুলের কথা শেষ হবার আগেই মহেশ চেঁচিয়ে উঠলেন—'বলবে আবার কি ! বলবে আমার গুষ্টির মাথা। বস্তিশুদ্ধু লোককে নেমন্তন্ন করে দিয়ে—নে এবার কি খাওয়াবি খাওয়া !'

নিতান্ত অকারণে তিনি একখণ্ড কাঠ নিয়ে উনুনে ফেলে দিলেন।

অতুল উবু হয়ে বসে ময়দা ঠাসছিল, মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

হাসি দেখে মহেশের সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠলো, তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন, 'হেসো না বলছি অতুল, ভাল হবে না।'

অতুল নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিলে, না, 'হাসবে না! দাদার বিয়ে, বসে বসে কাঁদবো? তুমি বেশী চেঁচিয়ো না বলছি ঘোষাল! এতদিন ধরে দুধে জল ঢালছো, তোমার কাছে টাকা নেই বললেই আমি বিশ্বাস করবো কি না! টাকা নেই তো এসব এলো কোথেকে! এসব এলো কোথেকে?'

—'দোকান থেকে ধার করে আনলাম।'

—'ধার করে আনলে শোধ করবে।'

—'আমি যদি শোধ করতে না পারি?'

—'তোমার বাপ্ পারবে।'

রাগে মহেশের কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো, তিনি হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাপ্ তুলে কথা বলো না বলছি অতুল, মেয়ের বিয়ে আমি দেব না।

—'তোমার বাবা দেবে,' বলে অতুল তেমনি হাসতে লাগলো।' মহেশ একখণ্ড কাঠ হাতে করে উঠে দাঁড়ালেন, 'কাপড়টা কোমরের সঙ্গে ভাল করে জড়াতে জড়াতে রুখে উঠলেন, 'অতুল!'

অতুল ময়দার একটা তাল হাতে নিয়ে বললে, 'চুপ করে বসো ওইখানে, ভাল চাও তো লুচিগুলো বেলে দাও।'

রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে মহেশ বললেন, 'তোমার কথাতেই বেলবো। না?'

কিন্তু ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়ালো না, বোধকরি তাঁর মনে পড়ে গেল যে কন্যাসম্প্রদান আরম্ভ হতে আর দেরী নেই, তিনি মুখভার করে ময়দার তাল নিয়ে লুচি বেলতে বসলেন। কিন্তু মেজাজটা গরম, তার ওপর এসব

কাজের অভ্যাসও নেই অনেকদিন, লুচিগুলো বেলতে যেতেই ছিঁড়ে যেতে লাগলো, যেগুলো ছিঁড়লো না সেগুলোর আকৃতিও ভয়াবহ বিসদৃশ হয়ে উঠলো।

অতুল লুচিগুলোর দুর্দ্দশা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, বললে, 'থামো। যা জানো না তা করতে যাও কেন? তুমি গরুকে জাবনা দাওগে যাও।'

মহেশ রাগে ফুলতে ফুলতে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছ্যাখো অতুল, আমি কিন্তু সহজে রাগি না। আবার রাগি যখন তখন আর আমার জ্ঞান থাকে না।'

মহেশের কথার ভঙ্গীতে অতুল হেসে ফেললো; ময়দা মাখা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে উঠে গিয়ে বসলো মহেশের পাশে; তাঁব সামনে থেকে চাকী বেলুনটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমারও তাই ঘোষাল। তবে তোমায় যা জামাই করে দিলাম ঘোষাল, একদিন বলতে হবে দেখো। দাদা আমার যা ইংরেজী বলে, শুনো একদিন—মনে হবে সায়েবে বলছে। চা'র পাঁচটা বড় বড় পাশ করেছে, বুঝলে? পড়া আব শেষই হয় না, শেষই হয় না! এমন সময় বাবা মরে গেল, মা মরে গেল, রইলাম আমরা দুটি ভাই—নইলে এই বস্তিতে এসে থাকি! রাম বল! রাম বল!—দাও, ঝপ্ ঝপ্ দাও, লেচিগুলো কাটো—কোনো কাজের নও ঘোষাল, শুধু গরুর সেবা করতেই জানো। দাদা এতদিন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে যেত, হয়নি, ভারি মিছে কথা বলে যে!'

—'কি বললে? মিছে কথা বলে?'

মহেশ যেন চমকে উঠলেন। অতুলের মনে হোলো কথাটা বলা ঠিক হয়নি, সে তখনই বললে, 'না, অন্যের সঙ্গে বলে না, বলে এই আমার

সঙ্গে। এই ধর না—এই বিয়ের ব্যাপারটা। মনে মনে ইচ্ছেটা আছে—ষোল আনা, আমি ওর মুখ দেখে সব বুঝতে পারি, আর বলে কি না, তুই বিয়ে কর। আচ্ছা, তুমিই বল ত ঘোষাল, আমি না জানি লেখাপড়া, না জানি রোজগাড় করতে, আমার মত মুখ্যুর হাতে তোমার ওই মেয়েকে দিলে বেচারীর কষ্টের আর সীমা থাকতো না—সেই কথায় বলে না বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।'

মহেশ 'হা' 'না' কিছুই বললেন না, একমনে লেচি কাটতে লাগলেন। তার পরেই এলো পণ্ডিতের তাগাদা, কন্যা সম্প্রদান করতে হবে মহেশকে। মহেশ উঠে গেলেন। উলুধ্বনিতে সারা বাড়ী মুখর হয়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে চুকে গেল বিয়ের পাট। বাঁদরওলা থেকে আরম্ভ করে ভিখিরীর দল পর্য্যন্ত সবাই একে একে এসে খেয়ে গেল পেটপুরে। লুচি ভাজা থেকে আরম্ভ করে পরিবেশন পর্য্যন্ত সব অতুলই করলে একা!

কয়েক মাস পরের কথা।

কমলা এসে শিবনাথ আর অতুলের গৃহস্থালার ভার নিয়েছে; অতুলের কাজকর্ম্ম গেছে ফুরিয়ে। সকাল বেলা বাজারটা এনে ফেলে দিতে পারলেই সমস্ত দিন তার ছুটী। কি করে অতুল এত সময় নিয়ে? কমলা রাঁধতে বসলে বসে বসে গল্প ফাঁদে তার সঙ্গে, এক একদিন আবার উপযাচক হয়ে কুটনো কুটে, বাটনা বেটে কমলাকে সাহায্য

করতে চায়। কিন্তু কমলা তাতে একেবারেই নারাজ। সংসারের সব কাজ সে দেখতে দেখতে এমন চটপট করে সেরে ফেলে যে অতুল দেখে অবাক হয়ে যায়। অতুলদের সংসারের কাজ সেরে কমলা আবার ছোটে বাপের কাছে, বুড়ো বাপ, তার সংসারের কাজগুলোও সেরে দিয়ে আসে ফাঁকে ফাঁকে। কমলার দু'হাতে যেন এক'শ' মানুষের কর্ম্মশক্তি; কটা মাস কাটতে না কাটতেই অতুল আর শিবনাথের সেই ভাঙ্গা অন্ধকার ঘর দুটী সেবা আর শ্রীতে আলো হয়ে ওঠে।

কিন্তু তবু অতুলের যেন ভাল লাগে না। সব যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। সহরের মাঝখানে যেন হাঁপিয়ে উঠে তার মন, লালায়িত হয়ে ওঠে গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু সেখানে না আছে কোন আত্মীয় স্বজন, না আছে মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা। সেখানে যাবার কোন মানে হয় না।

কমলার কাছ থেকে উঠে গিয়ে অতুল হয় মহেশ ঘোষালের গরু-গুলোব জন্যে চারটী বিচুলি কেটে দিয়ে আসে, নয়ত পণ্ডিতের বাসায় গিয়ে হুঁকোর মাথায় কল্কে চড়িয়ে বসে দাবা খেলতে। ইদানিং আবার পণ্ডিতের এক ভাই এসে জুটেছে—গোকুল। গোকুল বসে বসে স্বরোদ বাজায়। দাবা খেলতে খেলতে সেটা মন্দ লাগে না অতুলের।

সেদিন পণ্ডিতের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে জব্বর একটা চাল দিয়ে মন্ত্রীকে সাংঘাতিক একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করে অতুল বলে উঠলো, বস্, মার দিয়া। এবার আমার ছুটি।'

পণ্ডিত পাল্টা একটা চাল ভাবতে ভাবতে বললে, 'ছুটি বললেই ছুটি। কই যাও দেখি!'

অতুল বললে, 'না, তোমার কথাতেই যাব না! দাদার বিয়ে দিলাম, আমার আর কি কাজ! ভাত রাঁধবার লোক হোলো, সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করবে, আমি বরং এক একবার এসে দেখে যাব, না কি বল—'

হঠাৎ গোকুলের স্বরোদের আলাপটা অতুলের কাণে ভারি বিশ্রী আর এক ঘেয়ে লাগলো; বিরক্ত ভাবে সে বলে উঠলো, 'আঃ তোমার এই ভাইটা কি রকম হে! কাণের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা—থাম্ বাবা থাম্।'

গোকুল মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন হে ভাল লাগছে না?'

'—না লাগছে না।'

গোকুল স্বরোদটা নামিয়ে রেখে দাবার আসরে এসে দাঁড়াল, বললে, তা হলে এইখানে বসে বসে তোমাদেব খেলা দেখি।'

অতুল কি যেন ভাবছিল, মুখ তুলে বললে, 'না, না। তার চেয়ে তুমি যেখানে থাকো—সেই কোথায় কোন্ কোলিয়ারীতে—আমার জন্যে একটা কাজ কর্ম্ম ত্থাখো না দাদা, আমার উপকার করা হবে।'

গোকুল খুসী হয়ে উঠলো, বললে, 'করবে কাজ? দাদাও তো বলছে যাবে।'

—'যাবে নাকি হে পণ্ডিত?'

'—হ্যাঁ, ভাবছি সেখানে একটা পাঠশালা করবো।'

অতুল রীতিমত উল্লাসিত হয়ে উঠলো, হুঁকোটায় সজোরে একটা টান দিয়ে বললে, 'আমিও যাব, নিশ্চয় যাব।'

গোকুল জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাত রাঁধতে পারবে?'

অতুল একমুখ হেসে বললে, 'শোনো পণ্ডিত, শোনো, তোমার ভাই শুধোয় কি না—আমি ভাত রাঁধতে পারবো? হুঁঃ, এই রকম বুদ্ধি না হলে তুমি পণ্ডিতের ভাই হও!'

'তা হলে চল তুমি আমার সঙ্গে।' গোকুল বললে।

অতুল উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'যাব নিশ্চয়ই যাব, তোমায় কথা দিয়ে রাখলাম।'

পণ্ডিত পাল্টা চাল দিয়ে বললে, 'ভাল কথা। নাও এখন তোমার মন্ত্রী সামলাও—'

অতুল আবার দাবার ছকের দিকে মন দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মন্ত্রী সামলাবার আগেই বাইরে থেকে শোনা গেল ঢেঁড়া পেটানোর শব্দ।

পণ্ডিত তার ভাইকে দেখে আসতে বললে। ব্যাপারটা কি।

গোকুল বাইরে থেকে ঘুরে এসে জানাল, সহরে ভয়ানক বসন্ত হচ্চে। তাই ঢেঁড়া দিচ্ছে।

অতুলের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। পণ্ডিত বললে, 'নাও, নাও, ওসব কথা পরে ভেব। এখন তোমার মন্ত্রী সামলাও……'

কিন্তু বসন্ত সেবার সত্যিই মহামারীর আকারে দেখা দিল শহরের পাড়ায় পাড়ায়। শুধু বসন্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে কলেরাও। বস্তীকে বস্তী উজাড় হয়ে যেতে লাগলো। শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার দিয়ে লোকজনকে সাবধান করা হতে লাগলো, বলা হোলো টিকে নিতে। খবরের কাগজে পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগলো প্রতিদিন, টিকে দেবার জন্যে কর্পোরেশনের লোক ঘুরতে লাগলো অলিতে গলিতে।

সেদিন অতুলদের বাসাতেও টিকে দেবার জন্য লোক এসে হাজির। অতুল তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে কমলার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, 'বৌদিদি, ও বৌদি—'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কমলা বললে, 'কি বলছো?'

—'টিকে নাও টিকে নাও।'

—'ওঃ এই কথা! আমি বলি, কি রাজ্যপাঠ নিয়ে এলে বৌদিকে দিতে!'

—'বস্তিতে কি রকম বসন্ত হচ্ছে দেখেছ?'

—'তোমরা নতুন লোক, তোমরা ছাখো। আমি অনেক দেখেছি।' কমলার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হোলো না যে টিকে নেবার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ আছে। অতুল চটে উঠলো, বললে, 'টিকে না নিয়ে কি মরবে?' কমলা হাসতে হাসতে জবাব দিলে, 'ভালই তো হবে। ভাগ্যবানেরই বৌ মরে। তোমার দাদার আর একটা বিয়ে দেবে।'

—'ও সব বাজে কথা রাখ। টিকে নেবে কি না বল।'

—'তুমি নাও গে।'

বলে কমলা ঘরে ঢোকবার উপক্রম করছিল। অতুল বলে উঠলো, হ্যাঁ, আমি নেব বইকি! আমার মরলে চলবে কেন? আমি তোমাদের রোজগার করে এনে খাওয়াচ্ছি যে!'

—'তা হলে যে রোজগার করছে তাকে দাও গে।'

—'তাকে পাচ্ছি কোথায়! কোথায় সে?'

—'আমি কি তার মনিব যে যাবার সময় বলে যাবে কোথায় যাচ্ছে!' কমলা গিয়ে ঘরে ঢুকলো। অতুল সেইখান থেকেই বললে, 'টিকে তা হলে তুমি কিছুতেই নেবে না?'

ভেতর থেকে উত্তর এলো, 'না!'

—'কিছুতেই নেবে না?'

কমলা আবার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, বললে, 'না, না। টিকে আমার এ সময় নিতে নেই।'

অতুলের বিস্ময়ের আর অন্ত রইলো না, বললে, 'নিতে নেই ? কেন ?'

—'সবই কি তোমায় বলতে হবে ঠাকুর পো ? তোমার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।'

বলে কমলা হাসতে হাসতে ঢুকলো গিয়ে ঘরের ভেতর।

বাহিরে যে লোকটী টিকে দেবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে ডাকাডাকি সুরু করে দিল। অতুল কোন রকমে তাকে বিদেয় করলে। মনটা তার কদিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না, এবার রীতিমত বিগড়ে গেল। কি অদ্ভুত জাত এই মেয়েগুলো! কোন কথা খুলে বলবে না। হঠাৎ বললে টিকে নিতে নেই। কেন রে বাবা ? উঃ, এদের পাল্লায় পড়লে মানুষ কত সহজে পাগল হয়ে যেতে পারে! নাঃ, দরকার নেই তার এ সব ঝঞ্ঝাটে। যারা মন খুলে কথা বলতে পারে না, তাদের জন্যে ভেবে লাভ কি! তার চেয়ে সে নিজেই চলে যাবে যে দিকে দুচোখ যায় সেই দিকে।

অতুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছে, গোকুল পুঁটলী-পোটলা বেঁধে নিয়ে উপস্থিত। বললে, 'চল, চল, আর দেরী কেন ?'

লোকটাকে দেখেই অতুল খুব রেগে উঠেছিল, তার কথা শুনে রাগের মাত্রা বাড়লো বই কমলো না, সে বললে, 'দেরী করছি কি আর সাধেরে বাবা! তোমার বুদ্ধি দেখে দেরী করছি। পণ্ডিতের ভাইয়ের বুদ্ধি আর কত হবে ?' গোকুল বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারলে না, বললে, 'কেন, আমি আবার কি করলাম ?'

—'করলে না ?' অতুল বলে উঠলো—'এই যে আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ ? যাব, দাদা কি বলবে জানো ? পণ্ডিতের ভাই—পাজী, ইষ্টুপিট, গাধা, মুখ্যু—আমার হারামজাদা ভাইটাকে নিয়ে পালালো,

আমাদের এই বিপদের মাঝখানে ফেলে! জানি, জানি, দাদা তো নয়, শত্রু! আমার সব জানা আছে। লেখাপড়া শিখেছে, তোমরা সবাই বিদ্বান বিদ্বান করো, বিদ্বান না ছাই! মুখ্যু!—এই যে বস্তির চারিদিকে কলেরা বসন্ত লেগেছে, টিকে নিয়েছে বলতে চাও? নেয়নি। মরবে। আমিও বাবা তেমনি—হেঁ, হেঁ—চড়্ চড়্ করে টেনে একেবারে হাসপাতালে।'

শেষ পর্য্যন্ত অতুল গোকুলকে স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে আপাততঃ তার যাওয়া সম্ভব নয়। তবে পণ্ডিত আর গোকুল যেতে পাবে। এদিককার হাঙ্গাম' একটু কমলেই সেও গিয়ে হাজির হবে।

ঘোষাল যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে, অতুল হাঁক পাড়লে—'ঘোষাল! ও ঘোষাল মশাই—'

ঘোষাল এগিয়ে এসে বললেন, 'কি বলছো?'

অতুল মনে মনে বললে, মেয়ে ত বললে নিতে নেই, বাপ আবার কি বলে দেখি! তারপর ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করলে,'টিকে নেবে না? বসন্তের টিকে?'

জবাবে ঘোষাল বললেন, 'আমাকে আবার বুড়ো বয়সে ও সব কেন, ও সব ফোঁড়া ফুঁড়িতে আমি নেই। আমার কিছু হবে না তুমি দেখে নিও। আমার কখন কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং আমার মেয়েকে—' বলেই তিনি কমলাকে ডাকতে ডাকতে তাদের বাড়ীর দিকে এগোলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস!

ক'টা দিন যেতে না যেতে মহেশই রোগে পড়লেন, প্রথম দিন প্রচণ্ড জ্বর এলো, তারপর বসন্তের গুটীতে ছেয়ে গেল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ! বিছানায় পড়ে তিনি শুধু জল জল বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

সেদিন অতুল তাঁর ঘরে ঢুকছে, মহেশ ভাবলেন, কমলা। চোখ বন্ধ করেই তিনি করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কমলা, বড় জ্বালা মা, এক গ্লাস জল দে—'

অতুল কলসী থেকে জল গড়াতে গড়াতে বললে, 'কেন? আমার কিছু হবে না, আমার কখনও কিছু হয় না—এখন অত চেঁচাচ্ছ কেন? ওকে, এ সময় ডেকো না বুঝলে?'

জল এনে মহেশের মুখে ঢালতে ঢালতে অতুল বললে, 'নিজের সর্ব্বনাশ করে আবার মেয়েটাকে মারবে কেন, নাও, খাও কত জল খাবে খাও। খেয়ে মর!'

বাহির থেকে কমলার গলার স্বর শোনা গেল, 'ঠাকুর পো—'

অতুল কিছু বলবার আগেই কমলা এসে ঢুকলো ঘরে, বললে, 'ও কি বলছো ঠাকুর পো? মরবার কথা বলতে আছে?'

অতুল রাগত ভাবে জবাব দিলে, 'বলছি বেশ করছি, তোমার বাবাকে বলছি। তোমার তাতে কি? তুমি এখানে কি জন্যে মরতে এলে বলো তো? তুমিও মরবে বুঝি? এ সব ভারি ছোঁয়াচে রোগ।'

মুখভার করে কমলা জবাব দিলে, 'আমি মরলাম তো তোমার কি?'

অতুল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, 'আমার বয়ে গেল! কপালে ভাত রাঁধা থাকে তো কোন্ শালা বন্ধ করবে!'

—'ভাত রাঁধবার জন্যে আমাকে তোমরা নিয়ে গেছ বুঝি?' কমলা জিজ্ঞাসা করলো।

অতুল বললে, 'না, দাদার জামদারীর একজন গোমস্তা দরকার ছিল, তারই জন্যে। কথা শোনো!'

কমলা রাগে ফুলছিল, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই ঘোষাল ডাকলেন, 'মা !' কমলা এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

অতুল ধমকে উঠলো—'বলি যাবে এখান থেকে না যাবে না ? তা হলে তুমি থাকো, আমি যাই।'

কমলা ঘুরে দাঁড়াল অতুলের দিকে, প্রায় চীৎকার করে বললে, 'তুমি কি ঠাকুর পো ? তুমি মানুষ ?'

'— না, আমি মানুষ নই, আমি জানোয়ার।'

—'হ্যাঁ, তুমি তাই।'

বলতে বলতে কমলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘোষাল যন্ত্রণায় ছট ফট করছিলেন, অতুল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'নিজে তো মরবেই, আবার মেয়েটাকে কেন মারছ ?'

ঘোষাল অতিকষ্টে চোখ মেলে চাইলেন, ভীতি বিহ্বল, সকাতর তাঁর চোখের দৃষ্টি। অসহায় ভাবে কিছুক্ষণ অতুলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, 'মরব ? বাঁচবো না ?'

অতুল বললে, 'কাজ যা ছিল তা তো চুকিয়ে ফেলেছ, এখনও তোমার বাঁচবার সাধ—?'

মহেশ আবার চোখ বুঁজলেন, কি যেন ভাবলেন মনে মনে, তারপর বললেন, 'দেখবো না ? দেখতে পাব না ?'

অতুল কথাটার কিছুই বুঝতে পারলো না, একটু বিরক্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আবার—দেখবে ?'

মহেশ আবার একটু চুপ করে রইলেন, তাঁর নিমিলিত চোখের

প্রান্ত দিয়ে ক্ষীণ একটী জলের ধারা পড়লো গড়িয়ে। তারপর তিনি বললেন, 'কমলার ছেলে হবে, দেখতে পাবো না ?'

—'সে হবে, যখন হবে তখন হবে। আমার ভাই পো হবে, কাঁধে পীঠে চড়িয়ে আমি একাই মানুষ করে ফেলবো, তোমার দরকার হবে না। তুমি এসো গে যাও, আর জ্বালিয়ো না।'

মহেশ অতুলের কথায় কোন জবাব দিলেন না। যন্ত্রণা আবার বোধ হয় বেড়ে উঠলো। তিনি ছট ফট করতে লাগলেন।

অতুল বলে উঠলো, 'হাসপাতালেও তো যাবে না বলছো! পয়সা আছে চিকিচ্ছে করবার ? দেখি তা হলে একবার চেষ্টা করে।'

ঘোষাল ক্ষীণ কণ্ঠে জানালেন, 'না, বাবা, পয়সা নেই।'

অতুল বললে, 'তার বেলায় তো বেশ কথা বেরুচ্ছে দেখছি! মর, মর তাহলে বিছানায় ছট ফট করে, কি আর করবে বলো!'

অতুল এমন ভাবে কথাগুলো বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যেন তার আর বিরক্তির অন্ত নেই! কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যেত, আর একটু পরেই সে কেঁদে ফেলবে!

টাকাকড়ির চিন্তায় শিবনাথ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। বিয়ের পর খরচ কিছু বেড়েছে, কিন্তু আয় বাড়েনি এক পয়সা। ভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টাটা অথচ সমান ভাবেই করে যেতে হচ্ছে। পরিচিত, অপরিচিত অসংখ্য লোকের কাছে ঋণের বোঝাটা শুধু বেড়ে

উঠছে দিনের পর দিন। বিবাহিত জীবনের যে মধুর কল্পনা শতকরা নব্বুই জন বাঙ্গালীর ছেলের মনকে ছেলেবেলা থেকে দোলা দেয়, বাস্তবের আঘাত লেগে সেটা প্রতিপদে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল, শিবনাথ প্রতীকারের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই!

সেদিন সকাল বেলা শিবনাথ তার ঘরটীতে বসে ভাবছিল এইসব কথা। কেবলই মনে হচ্ছিল, ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। নিজের এবং অতুলের সুবিধের জন্যে আর একজনকে এই দারিদ্র্যের মাঝখানে টেনে এনে সে মস্ত ভুল করে ফেলেছে। টাকা রোজগারের পথ যার বন্ধ, তার মনে কোন দুর্ব্বলতা থাকা উচিত নয়।

হাতে শীতলার ফুল জল নিয়ে কমলা এসে দাঁড়াল দরজার পাশে, ডাকলে, 'ওগো শুনছো?'

অন্যমনস্ক শিবনাথ বললে, 'উঁ!'

—'শীতলার এই ফুল-জলটুকু খাইয়ে দিয়ে এসো বাবাকে। তোমার তো একবার যাওয়া উচিত।'

—'তুমিই যাও না।' শিবনাথ তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে বললে।

কমলা বললে, 'ঠাকুরপো আমায় যেতে দিচ্ছে না যে, তেড়ে মারতে আসছে।'

কমলার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতুল ঘরে ঢুকলো, বললে, 'না, না, মারতে আসেনি, মিছে কথা বোলো না, ছোঁয়াচে রোগ, ঘাঁটাঘাটি করলে মরবে, তাই বারণ করছি।'

একটু চুপ করে থেকে অতুল কমলার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'টাকা আছে?'

কমলা একটু অপ্রসন্ন ভাবেই জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, টাকা যে দুভাইয়ে রোজগার করে দিচ্ছ এনে ! কথা শোনো !'

বলেই সে শীতলার ফুল-জল সমেত পাত্রটী হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতুল এবার দাদার দিকে দুপা এগোলো, বললে, 'তোমার কাছে আছে ? গোটা পাঁচেক হলেই হবে।'

'টাকা !'

শিবনাথ বিব্রত হয়ে উঠলো, অকারণে পকেটে হাত দিয়ে বার কয়েক খোঁজাখুঁজি করলে। অতুল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, বললে, 'নেইত আর খুঁজছ কি ? এই সোজা কথাটা মুখ দিয়ে বলতে পারছো না ? খুব রোজগার করছ যা হোক !'

নিজের অভাব এবং ভদ্রতারক্ষার প্রাণপণ সংগ্রামের কথাই শিবনাথ বসে বসে ভাবছিল, অতুলের ঠাট্টাটা চাবুকের মত বিঁধলো তার গায়, শিবনাথ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আঃ—'

—'আঃ আবার কি ! ওসব লুকোচুরি আমার ভাল লাগে না। থাকে তো দাও, না থাকে তো বলে দাও নেই। বাস্, ফুরিয়ে গেল—'

অতুল চলে যাবার উপক্রম করতেই শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, 'টাকা কি হবে ?'

অতুল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শ্বশুরটী যে মরতে চাইছেন না ! হাসপাতালেও যাবে না, আবার বাঁচতেও চাইবে !'

—'না, না, হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।'

বন্দী

—'হ্যাঁ, তারপর তোমার বউটী বাপের জন্মে বসে বসে কাঁদুক আর আমি তাকে নিয়ে দুবেলা হাসপাতালে আনাগোণা করি। আমার দায় পড়েছে। আমি এবার কোথায় পালিয়ে যাব দেখো!'

শিবনাথ প্রায় ধমকে উঠলো, 'তাই যা—'

—'যাব না ত কি!' বলতে বলতে অতুল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। অভাব, অভাব, অভাব! তার চারিদিকে অসংখ্য অভাব যেন হাঁ করে রয়েছে। ভাবতে গেলে কুল কিনারা পাওয়া যায় না। কি ক'রে সে এর প্রতিকার করবে? একদিকের ফুটো বন্ধ করতে না করতে আর একদিকের ফুটো যেন আরও বড় হয়ে ওঠে। সেটা বন্ধ করবার উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে প্রথম যেদিন সে এই সহরে চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছিল সেদিন আর পাঁচজনের মত একটী পরিপাটী পরিচ্ছন্ন সংসারের ছবি সেও এঁকেছিল বৈকি মনে মনে। কল্পনার সেই সংসারে স্নেহ, প্রীতি, মমতা কোন কিছুরই অভাব ছিল না। আজ কিন্তু মনে হয়, কল্পনার সেই ছবি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্নেহ মমতাবোধ পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে!

শিবনাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে বেরিয়ে এসে অতুলের মেজাজটা ভীষণ বিগড়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে সে ভাবতে লাগলো, বুড়ো মহেশ ঘোষালের চিকিৎসার জন্মে সত্যিই কি করা যায়! শিবনাথের দ্বারা যে কোন ব্যবস্থাই হবে না এটুকু সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। এখন যা হয়

একটা উপায় তাকেই খুঁজে বার করতে হবে। অতুল ভাবতে লাগলো। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম উপায়ই তার মনে হচ্ছিল, কিন্তু কোনটাই ঠিক যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ সেই সময় পণ্ডিতকে বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে দেখে অতুল উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অতুল বললে, 'এই পণ্ডিত, গাই কিন্‌বে বলছিলে, কিন্‌বে?'

গাই কেনবার ঝোঁক পণ্ডিতের অনেক দিনের। পণ্ডিত উৎসাহিত হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তার মানে আফিং খাই কি না, একটু খাঁটী দুধ হলে—'

—'তা পাবে, তা পাবে। দাও টাকা দাও।'

—'টাকা?' পণ্ডিতের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

অতুল সেটা লক্ষ্য না করেই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন অন্ততঃ গোটা পাঁচেক দাও, তারপর দরদস্তুর ঠিক করে বাকী টাকা দেবে'খন। গাই আমি তোমার ঘরে বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি।'

—'উহুঁ, টাকা তো এখন—তবে আর তোমায় দুঃখু করে বলছিলাম কি! একটা গাই হলে আর টাকা দিয়ে দুধ কিনতে হয় না।'

—'গাইটা ত কিনতে হবে?'

—'তা কিন্‌তে হবে। কিন্তু টাকা যে নেই!'

অতুল রেগে উঠলো, বললে, 'কি আর তোমায় বলবো পণ্ডিত! আফিং খেয়েই মরবে তুমি! গাইয়ের দুধ আর তোমায় খেতে হবে না।'

অতুল আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াল না।

মহেশ ঘোষালকে শীতলার ফুল-জল দিয়ে কমলা যখন ফিরে এলো শিবনাথ তখনও ঠিক সেই ভাবে বসে আছে।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, 'নিয়ে এলে ?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু বাবা যে বড় ছট্‌ফট্‌ করছে। আর একবার যাব ?

—'তোমার বেশী ঘাঁটাঘাঁটী করা উচিত নয়। ছেলে হবে বলছো অতুলই গিয়ে বসুক তাঁর কাছে—হতভাগা গেল কোথায় ?'

—'কি জানি! দেখি একবার খোঁজ ক'রে।'

কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতুল তখন মহেশ ঘোষালের গোয়ালে ঢুকে সব চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট গাই-গরুটির গলার দাড়িগাছটা ধরে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

পিছন থেকে কমলার ডাক শোনা গেল, 'ঠাকুরপো!'

—'ধ্যেৎ তেরি ঠাকুরপো! কী ?'

—'ওকি করছ ?'

—'কিছু করিনি। তোমরা আমার সঙ্গে কথা বোলো না, যাও—'

অতুল গরুর গলার দড়িগাছটা ধ'রে সজোরে একটা টান দিলে।

কমলা বললে, 'গাই কি হবে ?'

অতুল বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'বেচবো—বেচবো। ওই যে লোকটা চোখের সামনে বিনে চিকিচ্ছেয় মরে যাবে আর আমি তাই বসে বসে দেখবো ? ওসব আমার কুষ্টিতে লেখেনি।'

কমলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মহেশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মহেশ অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছিলেন, মুখের থুৎনিটা যেন ঝুলে এসেছে, চোখ দুটো আসছে বেরিয়ে। কমলা একা একা দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে পারলো না। ছুটে এ বাড়ীতে এসে ডেকে নিয়ে গেল শিবনাথকে।

বন্দী

ওদের পায়ের শব্দ কাণে যেতেই মহেশ ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি আর বাঁচবো না মা।'

কমলার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো অজস্র ধারায়।

অতুল এদিকে মহেশের গাইটিকে নিয়ে গিয়ে একজনের কাছে সমর্পণ করলে। দরদস্তুর কিছুই করলে না, শুধু বললে, 'দয়া করে গাইটা নিয়ে আমায় রক্ষে করুন মশাই।'

ভদ্রলোক অতুলের হাতে পাঁচটী টাকা দিলেন বটে, কিন্তু ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না; সন্দিগ্ধ ভাবে অতুলের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? অত ছটফট্ করছেন কেন?'

—'না, ছট্ফট্ করবে না।' অতুল উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো—'ছট্ফট্ কি আর সাধে করছি মশাই, ওদিকে একটা লোক মারা যাচ্ছে। দেখি একবার চেষ্টা করে। দিন, আর দুটো টাকা দিন।'

ভদ্রলোকের সেরকম কোন সদিচ্ছা দেখা গেল না, নির্বিকার ভাবে বললেন, 'তোমার তো আর নিজের গাই নয় দাদা। চুরি করা গাই, এই যথেষ্ট। আবার টাকা!'

চুরির কথা শুনে অতুলের মাথার মধ্যে আগুন জলে উঠলো দপ করে কিন্তু তখনই মনে পড়লো—মহেশ ঘোষাল মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্ফট করছে, সময়মত গিয়ে পৌঁছতে না পারলে তার এত ছুটোছুটীর কোন মানেই থাকবে না। অতুল নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'চুরি-করা গাই! হুঁ! দেখুন, অন্য সময় হলে এখুনি একটা ফৌজদারী হয়ে যেত। খুব বেঁচে গেলেন!

ভদ্রলোক আসল ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারলেন না। একটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা লোক তো!'

যেতে যেতে কথাটা অতুলের কানে গেল, ঘাড় ঘুরিয়ে সে বললে, 'হুঁ, আচ্ছা লোক যা!'

টাকা কটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে অতুল ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো। পথের লোকজন অবাক হয়ে চাইলো তার দিকে, অতুলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবারও সময় রইলো না। যখন সে মহেশ ঘোষালের বাড়ীর সামনে পৌঁছল তখন ভিতর থেকে কমলার আর্তনাদ প্রত্যাশিত দুঃসংবাদটাকেই নির্মম ভাবে প্রচার করছিল।

অতুলের সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে এল। কোন রকমে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। শিবনাথ দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে।

অতুল বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে—'দাদা!'

শিবনাথ ফিরে তাকালো অতুলের দিকে, তারপর শুধু বললে, 'হয়ে গেছে!' অতুল পাথরের মূর্তির মত সেই সঙ্কীর্ণ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, না পারলো এক পা এগিয়ে যেতে, না পারলো একটা কথা বলতে।

কমলার একটানা কান্নার শব্দ শুধু তীরের মত বিঁধতে লাগলো তার দুই কানে।

কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বললে, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা কর।'

অতুলের যেন চেতনা ফিরে এলো, 'হ্যাঁ, করি।'

কিন্তু কি যে করবে হঠাৎ কিছুই সে ভেবে পেল না। অসহায় একটা ক্ষোভে তার চোখ দুটো জ্বালা করছিল। বুড়ো মহেশ ঘোষালকে তা হলে সত্যিই বাঁচানো গেল না! মাঝখান থেকে বেচারীর গাইটাই শুধু বিক্রী হয়ে গেল।

অতুল নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, 'টাকাকড়ি কিছু আছে?'

অতুল বললে, 'আছে। বাঁচাবার টাকা জোগাড় করতে পারি নি দাদা, কিন্তু পোড়াবার টাকা ঠিক জোগাড় করে এনেছি। এই নাও—'

টাকাকটা সশব্দে উঠোনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অতুল বাইরে বেরিয়ে গেল লোকজনের সন্ধানে।

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?'

বুড়ো মহেশ ঘোষালের মৃত্যুর স্মৃতিও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। তারপর একদিন শিবনাথদের সংসারে আবির্ভাব হয় একটী নতুন মানুষের। কলকাতা ছেড়ে পালাবার যে কল্পনাটা অতুল অনেক দিন ধরেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল, কমলার কোলে নতুন শিশুটীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেটা যে কখন্ কোথায় গিয়ে অতুলের মন ছেড়ে পালিয়ে গেল, সে তার খোঁজই পেল না।

কমলা সংসারের হাজার রকম কাজ আর রান্না নিয়েই বেশীক্ষণ ব্যস্ত থাকে—কাজেই ছোট্ট ভাইঝিটীর তদারকের ভার অতুলকেই নিতে হয়। শিবনাথ তো দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, সংসারের এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ নেই তার। তা' ছাড়া মেজাজটাও শিবনাথের দিন দিন এমনই রুক্ষ হয়ে উঠছে যে সংসারের কোন কথা বলতে গেলেই সে একেবারে জ্বলে ওঠে। কচি মেয়েটার দুধের পয়সা পর্য্যন্ত জোটে না অনেক দিন, অতুলকেই চেয়ে চিন্তে এখান সেখান থেকে জোগাড় করে আনতে হয়। মহেশ ঘোষালের বাকী কটা গাইও অনেক আগেই দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে, সেগুলো থাকলেও এ সময় অতুলকে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হতো না।

সেদিন অতুল বাড়ীর দাওয়ায় বসেছিল চিন্তিত ভাবে, হাতে একটা বাটী নিয়ে। মেরাসিনওয়ালী চাঁপা ওকে সেইভাবে বসে থাকতে দেখে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। তারপর কি যেন ভেবে এসে দাঁড়াল অতুলের কাছে।

বন্দী

—'দাদাবাবু, বলি ও দাদাবাবু!'

—'উঁ!'

—'বসে বসে ঘুমুচ্ছ নাকি! ভাইঝি হোলো, বখসিস দাও?'

—'বিরক্ত করিসনি বলছি। যার ছেলে হয়েছে তার কাছে নিগে যা। বেরো, বেরো—'

চাঁপা গেল না, হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কার ওপর রাগ হোলো? হাতে বাটী কেন?'

অতুল হাত পা নেড়ে বলে উঠলো—'আরে বাবা, দুধ আনবো। সেই কোন্ সকাল থেকে বসে আছি, বাবু গেছেন পয়সা আনতে, এখনও দেখা নেই।'

—'পয়সা আনতে? কটা পয়সা?' জিজ্ঞাসা করলে চাঁপা।

অতুল বললে, 'চারটে পয়সা হলেই হবে—চারটে পয়সা বুঝলি? বাবুর কাছে তাও নেই। যা যা আর বিরক্ত করিস নি, মন মেজাজ আমার বিগড়ে গেছে। আমি যেন শালা কয়েদী বন্দী হয়ে আছি। আমারই যেন সব দায়!'

একটু চুপ করে থেকে অতুল আবার বললে, 'বয়ে গেছে, আমি আর থাকছি নে। পণ্ডিতের সঙ্গে গেলেই হোতো, থাক, পণ্ডিতকে বলাই আছে। যাব একদিন ছুট করে পালিয়ে, বুঝলি?'

চাঁপা আঁচল থেকে পয়সা খুলতে খুলতে বললে, 'না, না, আর পালাতে হবে না দাদাবাবু। চারটে পয়সা আমি দিচ্ছি।'

চাঁপার কাছ থেকে পয়সা ধার করতে অতুলের বাধলো, সে বললে, 'শেষে তোর কাছে—?'

চাঁপা তেমনি হাসতে হাসতে বললে, 'দোষ কি!'

অতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'শেষ পর্য্যন্ত তোর কাছ থেকে পয়সা নিতে হলো—হা ভগবান! দে—তাই দে চট্ করে, কেউ যেন না দেখতে পায়।'

চাঁপা একটি একানি বার করে অতুলের হাতে দিতে দিতে বললে, 'দেখুক না। এই নাও, আমি ততক্ষণ মেয়ে দেখে আসি।'

চাঁপা ভিতরে চলে গেল। অতুলও যাচ্ছিল দুধের সন্ধানে, হঠাৎ ওর চোখ পড়লো একদল হিজড়ের ওপর, ঢোল কাঁসি নিয়ে তারা এই দিকেই আসছে। বুঝতে বাকী রইলো না যে কেউ ওদের খবর দিয়েছে। অতুলের মুখ শুকিয়ে গেল। ঘরে একটা পয়সা নেই, এদের সে বিদেয় করবে কি দিয়ে? অতুল ভাবতে লাগলো কি করা যায়। তারপর হঠাৎ ঘরে ঢুকে নিজের লাঠী গাছটা নিয়ে এসে দাঁড়াল বাইরের রোয়াকে।

হিজড়ের দল ততক্ষণে এসে পড়েছে।

ওদের একজন অতুলের মার-মূর্ত্তি দেখে হাসতে হাসতে বললে, 'কি গো দাদাবাবু, মারবে নাকি?'

অতুল লাঠিটা সজোরে রকের উপর ঠুকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'বেরো, বেরো এখান থেকে, নইলে এখুনি এই লাঠির বাড়ী—'

হিজড়ের দল গেল ভড়কে। একজন প্রতিবাদে কি বলবার চেষ্টা করতেই অতুল আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, বললে, 'রাগিও না বলছি, হঠাৎ একটা খুন খারাপী হয়ে যাবে—'

লাঠিটা অতুল সত্যিই উঁচু করে ধরেছিল, এমন সময় পাশ থেকে শিবনাথের গলা শোনা গেল, 'অতুল!'

অতুল লাঠিটা নামিয়ে রাগে ফুলতে লাগলো।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হচ্ছিল কি ?'

হিজড়েদের একজন আনুনাসিক মেয়েলী কণ্ঠে নালিশ সুরু করলে—'ভ্যাখো তো দাদাবাবু ভ্যাখো, তোমার চাকরটা মারতে আসছে।'

শিবনাথ পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে ছুড়ে দিলে; বললে, 'যা, পালা।'

টাকা পেয়ে হিজড়ের দল খুশী হয়ে উঠলো, একজন এগিয়ে এসে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাজাব না ?'

অতুল ধমকে উঠলো, 'ফের কথা বলে !'

হিজড়ের দল ফিরে গেল। শিবনাথ ভিতরে ঢুকছিল, ঠিক সেই সময় চাঁপা বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, 'আমার বখ্‌শিষটা দাদাবাবু ?'

শিবনাথ পকেট থেকে আর একটা টাকা বার করে চাঁপার হাতে দিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেল।

অতুল চাঁপার দিকে চেয়ে বললে, 'তোর চারটে পয়সা শোধ হয়ে গেল।'

চাঁপা হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ হোলো। আবার আসবো কিন্তু।'

অতুল আর সেখানে দাঁড়ালো না, ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকে শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এত টাকা কোথায় পেলে দাদা ?'

শিবনাথ জামা খুলছিল, রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলে, 'যেখানেই পাই, তোর কি ? তোর গালাগালি আর আমি সইতে পারছি না।'

পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো নোট বার করে শিবনাথ আবার বললে, 'এই নে পঞ্চাশটা টাকা। ভাল একটা বাড়ী দেখে চল্ এখান থেকে উঠে চল্—'

বন্দী

অতুলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। দুটো নয়, দশটা নয় একেবারে পঞ্চাশ টাকা! খানিক অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে অতুল বললে, 'চাকরী তা হলে তুমি পেয়েছ?'

শিবনাথ অতুলের কথার জবাব না দিয়ে কলের দিকে এগোল। অতুল পিছনে পিছনে যেতে যেতে বললে, 'আরে কথাও বলে না যে!'

শিবনাথ তবু চুপ করে রইল। অতুল আবার ডাকলে, 'দাদা!'

শিবনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী?'

অতুল বললে, 'চাকরি পেয়ে মেজাজ ছাখো! চাকরী পেয়েছ কি না তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

শিবনাথ এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে বললে, 'হ্যাঁ পেয়েছি।'

অতুলের মুখ খুশীতে ভরে গেল। দাদার চাকরী হয়েছে, এতদিন পরে সত্যিই তা হলে তার দাদার চাকরী হয়েছে! মনে মনে ঠাকুর দেবতার পায়ে প্রণাম জানিয়ে সে তাড়াতাড়ি হাতের নোট কখানা গুনতে লাগলো।

অবশেষে সত্যিই একদিন তারা বস্তী ছেড়ে পাকা বাড়ীতে উঠে এলো। প্রথম দিনটা নতুন গৃহস্থালীর গোছগাছ করতেই কেটে গেল। পরদিন একটু ফুরসৎ পেতেই অতুল কমলার কাছে গিয়ে বললে, 'ছাখো, ছাখো বৌ-ঠান, আমার কথা সত্যি হলো কি না!'

কমলা মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি একজন মহাপুরুষ লোক, তোমার কথা সত্যি হবে না? কি কথা?'

বন্দী

—'বারে! বলেছিলাম না—দাদা চাকরী পাবে, রোজগার করবে, বড়লোক হবে। কেমন, হলো তো?'

কমলা ঘুমন্ত মেয়েটীকে দোলনায় শুইয়ে দিতে দিতে বললে, 'বস্তির ভাঙা বাড়ীটা বদলেছ আর বড়লোক! তোমার তো বেশ নজর ঠাকুরপো!'

অতুল একটু অপ্রতিভ হলো বটে, কিন্তু নিরুৎসাহ হলো না। বললে, 'আরে এমনি করেই হয়—এমনি করেই হয়, তুমি জানো না, আরম্ভ হয়েছে—'

হঠাৎ বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। শিবনাথের সঙ্গে কে যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কাটাকাটি করছে। অতুল তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক কাবুলীওয়ালা, শিবনাথ তাকে কাতরভাবে বলছে, 'আরে আস্তেরে বাবা আস্তে, আমি তোর টাকা দিয়ে দেব।'

কাবুলীওয়ালা শিবনাথের কথা শুনতে নারাজ, হাতের লাঠিটা সজোরে রাস্তার উপর ঠুকে বললে, 'নেহি নেহি নেহি—ও বিলকুল ঝুটা বাত—উও হাম শুনেগা নেহি।'

শিবনাথ আবার করুণকণ্ঠে বললে, 'না সায়েব না, ঝুটা বাৎ নয় সায়েব, ঝুটা বাৎ নয়।'

কাবুলী আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'হামি জানলাম না, শুনলাম না—খবরটিভি দিলে না, আর তুমি বাড়ী বদলিয়ে চলিয়ে আসলে। ই হামি কী সমঝাবো!'

শিবনাথ আবার বললে, 'কিছুই সমঝাতে হবে না বাবা, ভারি তো সত্তরটা টাকা ধার নিয়েছি। বেশী চিল্লাও মাৎ। আমার ভাই রয়েছে বাড়ীতে, শুনতে পাবে।'

বন্দী

শিবনাথ অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, নইলে দেখতে পেত যে অতুল অনেক আগেই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাবুলী শিবনাথের অনুরোধে সম্মত হল না, বললে, 'শুনে গা তো কেয়া হোগা?'

শিবনাথ এবার একটু রাগতভাবে বললে, 'বলছি তুমি আসছে রবিবাব এসো, তোমার টাকা দিয়ে দেব।'

অতুল এতক্ষণে এগিয়ে এসে শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে, 'বাঃ দাদা! এই বুঝি তোমার রোজগার?'

লজ্জায়, ক্ষোভে শিবনাথের কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল, সে একটা কথাও বলতে পারলে না। অতুল এবার এগিয়ে গেল কাবুলীর কাছে, তাকে বললে, 'না, সাহেব না, ওর কথা শুনো না। রবিবারে টাকা ও দিতে পারবে না।' তারপর শিবনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,'পারবে দিতে?'

শিবনাথ জবাব দিলে না।

কাবুলী উৎসাহিত হয়ে বললে, 'বোলো তো বাবু বোলো তো, ঝুটা হারামীকে সমঝাও তো!'

দাদা রোজগারের বদলে কাবুলীর কাছে টাকা ধার করেছে সেজন্যে অতুলের ক্ষোভের সীমা ছিল না, তবু দাদার এত বড অপমানটা সে নিঃশব্দে মেনে নিতে পারলো না, কাবুলীর দিকে চেয়ে ধমকে উঠলো, 'না না সায়েব গালাগালি দিও না, গালাগালি দিও না।'

কাবুলী বললে, 'আরে গালাগালি কেয়া বোল্‌তা, ঝুটা আদমীকো মুমে হাম্‌লোক থুক দেতা!'

অতুল আবার ধমকে উঠলো—'বড্ডো বাড়াবাড়ি করছো সায়েব,

দাদা তোমার কাছমে যে টাকা ধার করতা, তাই এখনও কুছ নেই বোল্‌তা, তা না হলে একটি চড়ে তোমাকে এতক্ষণ কাবুল পাঠায় দেতা।'

অতুলের রাগের মাত্রা বাড়ছে বুঝতে পেরে শিবনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এসব ব্যাপারে রাগারাগি করলে যে শুধু কেলেঙ্কারীই বাড়ে, সেকথা গোঁয়ার-গোবিন্দ অতুল বুঝবে কি করে! শিবনাথ তাকে থামাবার জন্য ডাক্‌লো, 'অতুল!'

কাবুলী এগিয়ে গেল অতুলের দিকে, বললে, 'তোম মারে গা?'

—'হাঁ, মারে গা।'

—'মারো।'

—'তুম বল আর একবার।'

—'হাজার দফে বোলতা তোমলোক হারামী, হারামী, হারামী।'

অতুলের আর সহ্য হলো না, গায়ের সমস্ত রক্ত যেন চট্‌ করে চড়ে গেল মাথায়! কাবুলীর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে সে হাঁকলে 'তবে রে ব্যাটা! তোর এই লাঠি দিয়ে তোকে—'

আর এক মিনিট দেরী হলেই অতুলের হাতের লাঠিটা পড়তো কাবুলীর মাথায়। শিবনাথ উদ্যত লাঠিটা ধরে ফেললো, তারপর টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাবুলীকে বললে,—'যাও' এখন যাও।'

অতুলের উগ্রমূর্ত্তি দেখে কাবুলী রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। লাঠিটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'আচ্ছা, হামি দেখিয়ে লিবে।'

অতুল চীৎকার করে বললে, 'আরে হ্যাঁ! ভয়ে পুক পুক করে যারা তাদের দেখবি। আমাকে নয়।'

বন্দী

অতুল আর শিবনাথের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে কাবুলী চলে গেল।

তারপর দুই ভাই কিছুক্ষণ চুপচাপ!

শিবনাথ ভাবছিল, এতদিনে তার দুরবস্থার কিছু জানতে আর কারও বাকী রইলো না!

অতুল ভাবছিল., দাদা—তার দাদাকে একটা কাবুলীতে অপমান করে গেল, সে কিছু করতে পারলো না!

অবশেষে শিবনাথ বললে, 'এ তুই কি করলি বল্ দেখি?'

অতুল যেন বোমার মত ফেটে পড়লো—'বেশ করলাম, বেশ করলাম। ও ব্যাটা গালাগালি দেবে কেন?'

শিবনাথ অতুলের দিকে চাইতে পারছিল না, মুখ নিচু করে বললে, 'আমি যে ওর কাছে টাকা ধার করেছি।'

—'খুব ভাল কাজ করেছ। আমি এদিকে ভাবছি তুমি চাকরী পেয়েছ, রোজগার করছ, আর তুমি কিনা—খুব বাহাদুর!'

ক্ষোভে, দুঃখে অতুলের চোখ ফেটে জল আসছিল; শিবনাথ আর সেখানে দাঁড়াতে পারলো না।

স্তব্ধ নির্ব্বাক অতুল কতক্ষণ যে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো তার হিসেব নেই। তারপর নিজের মনেই বললে, 'মর এই বার! মারুক ও ব্যাটা তোমায় রাস্তায় ধরে। আমার কি! এইবার তোমার ঘর সংসার হোলো, আমি এইবার কোন্ দিকে পালিয়ে যাব দেখে নিও!'

দিনকয়েক পরের কথা।

শিবনাথ সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একেবারে কাবুলীর সামনে

পড়ে গেল। এ ক'দিন সে কাবুলীকে এড়াবার জন্য গলি ছাড়া বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটে নি, সেদিন কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়া গেল না।

শিবনাথকে দেখেই কাবুলী চেঁচিয়ে উঠলো,'ইয়া, ইয়া বাবু, শুনো·······'

শিবনাথ তার কথায় জবাব না দিয়ে অন্য দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো। কাবুলী নাছোড়বান্দা, সেও তার পিছু নিল!

রাস্তার ওপর এখুনি লোকটা গালাগালি সুরু করবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে শিবনাথ চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলো। কি যে করবে কিছুই সে ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎ সামনে পড়লো প্রকাণ্ড একটা বাড়ী, বাড়ীর সদর দরজা খোলা। শিবনাথ আর কোন দিকে লক্ষ্য না করে ঢুকে পড়লো সেই দরজার ভেতর। এত বড় বাড়ীর মধ্যে ঢুকে হাঙ্গামা বাধাবার সাহস কাবুলীর নিশ্চয় হবে না।

শিবনাথ ভিতরে ঢুকেই দরজার আড়ালে আত্ম গোপন করলো। কিন্তু কপাল মন্দ হলে বিপদ সব জায়গাতেই। শিবনাথ ভেবেছিল, এইখানে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে চলে যাবে। হঠাৎ দেখা গেল উপর থেকে সতের আঠার বছরের একটী মেয়ে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। শিবনাথকে সেইভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটী অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, 'কে আপনি?'

শিবনাথ কি জবাব দেবে ঠিক করতে পারলে না, বললে, 'আমি—আমি—এই······'

মেয়েটীর নাম ভারতী। সে কিছুক্ষণ শিবনাথের দিকে চেয়ে রইলো এবং কি যেন ভেবে স্থির করলো ইতিমধ্যে। তারপর বললে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এইদিকে আসুন। হারাধন!'

বন্দী

ভারতীর ডাক শুনে চাকর হারাধন ছুটে এলো। ভারতী বললে, 'কি রকম লোক তুই? ভদ্রলোক ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বাবার ঘরে নিয়ে যা।'

ভারতী শিবনাথের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে নেমে এসে নীচের ঘরে ঢুকে গেল। শিবনাথের বুকের ভেতরটা কাঁপছিল ভয়ে আর উত্তেজনায়!

কাবুলীকে এড়াতে গিয়ে এ আবার কোথায় এসে পড়লো কে জানে!

হারাধন বললে, 'চলুন বাবু—'

শিবনাথ চমকে উঠে বললে, 'চলো।'

হারাধনের সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ উপরে উঠে এলো। তারপর ঢুকলো এসে সাজানো গোছান প্রকাণ্ড একটা ঘরের ভেতর। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মস্ত একটা চেয়ার দখল করে বসে ছিলেন; তিনিই ভারতীর বাবা অবিনাশবাবু। সামনে টেবলের উপর এক রাশ কাগজপত্র, সেগুলো নেড়ে চেড়ে তিনি দেখছিলেন। হারাধন ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'কে?'

—'আজ্ঞে আমি হারাধন।'

জবাব শুনে অবিনাশবাবু খুসী হলেন বলে মনে হোলোনা; একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কতবার না তোকে বলেছি বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকবি—'

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর নজর পড়লো শিবনাথের ওপর; টেবল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে পরতে পরতে তিনি বললেন, 'এ আবার কে!'

বন্দী

শিবনাথ একটু এগিয়ে এসে অপ্রস্তুত ভাবে বললে, 'আজ্ঞে—আমি—'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না; বিজ্ঞাপন দিলে আর রক্ষে আছে! বসুন, বসুন।……পড়েছেন আমার বিজ্ঞাপন?'

শিবনাথ একটা চেয়ার দখল করে বসতে বসতে বললে, 'আজ্ঞে না।'

—'ও শুনেছেন? ওঃ একই কথা!—হারাধন!'

—'আজ্ঞে বাবু।'

—'আজ্ঞে! কতবার তোকে বলেছি না, বাইরের লোক ঘরে থাকলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবি।'

— 'আজ্ঞে তাই তো আছি।'

অবিনাশবাবু কতকটা আশ্বস্ত হয়ে শিবনাথের দিকে ফিরলেন।

—'এই ছ্যাখো কত দরখাস্ত, কত বি-এ, এম-এ। বলুন,…না, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, বল তোমার নাম বল।'

শিবনাথ আসল ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারছিল না, তবু বললে, 'আমার নাম শিবনাথ মুখোপাধ্যায়। আমি কিন্তু……'

—'শিবনাথ মুখোপাধ্যায়? ব্রাহ্মণ! ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিও ব্রাহ্মণ, চট্টোপাধ্যায়। আমার বাবা ছিলেন রায় বাহাদুর, এ অঞ্চলে সবাই চিনতো। নাম শুনেছ ত? হ্যাঁ, তোমার ঠিকানা?'

—'ঠিকানা? ঠিকানাটা—'

শিবনাথ উত্তর দিতে ইতস্তত: করতে লাগলো। অবিনাশবাবু বললেন, 'না, না, নাম ঠিকানাটা আগে দরকার। যা তা কাজ নয়। ম্যানেজারের কাজ।'

বন্দী

শিবনাথের কাছে ব্যাপারটা এতক্ষণে কতকটা পরিষ্কার হয়ে এল ; সে সাহসে ভর করে বললে, 'লিখুন,—পাঁচ নম্বর কলাবাগান লেন।'

অবিনাশবাবু ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললেন, 'শোনো এইবার বিজ্ঞাপনের মর্ম্মটা শোনো। পুরন্দরপুর গ্রামে আমার জমিদারীর জন্য ম্যানেজার চাই। খুব জবরদস্ত একজন ম্যানেজার। কড়া হাতে শাসন করতে হবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা।'

—'পঞ্চাশ টাকা !'

—'হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা। কম হলো ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অবিনাশবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন, 'তুমি পারবে না, পারবে না। তুমি যাও। বলে কত বি-এ, এম-এ, ঘোরাঘুরি করছে।'

শিবনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, 'আচ্ছা, তা হলে আমি যাই—'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা যাও।'

শিবনাথ যাবার জন্য পা বাড়ালো। কাবুলীটা এতক্ষণে চলে গেছে নিশ্চয়! যদি না গিয়ে থাকে তা হলেই বিপদ……

অবিনাশবাবু শিবনাথের দীর্ঘ পুরুষোচিত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ছিলেন, হঠাৎ ডাকলেন, 'শোনো।'

শিবনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বলুন।'

—'মারামারি করতে পারবে ?'

—'মারামারি !'

—'হ্যাঁ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা।'

—'পারব।'

—'গুলী ছুঁড়তে জানো ?'

—'জানি।'

—'ঘর জ্বালাতে পারবে।'

—'পারব, পারব। যা বলবেন তাই পারব।'

অবিনাশবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, চশমাটা চোখ থেকে নামাতে নামাতে বললেন, 'তা হলে শোনো বলি। বটুক বাঁড়ুয্যে বলে এক ব্যাটা শয়তান আছে, তাকে চাবকাতে পারবে ? পারবে চাবকাতে আমার সুমুখে ?'

অবিনাশবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, অনুপস্থিত বটুক বাঁড়ুয্যেকে এখুনি চাবকাতে পারলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু বেচারী শিবনাথ আবার ঘাবড়ে গেল, বললে, 'শুধু শুধু চাবকাতে যাব কেন ?'

অবিনাশবাবু সশব্দে টেবলে একটা ঘুষি মেরে বলে উঠলেন, 'শুধু শুধু ? তুমি জানো না, তাই বলছো শুধু শুধু !······গ্রাম দেখেছো ? আজ-কালকার পল্লীগ্রাম ?'

—'আজ্ঞে দেখেছি।'

—'বইয়ে পড়েছ না চোখে দেখেছ ?'

—'চোখে দেখেছি।'

—'তা হলে বটুক বাঁড়ুয্যের মত লোকও দেখেছ। দেখলে মনে হবে খুব ভাল মানুষ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শয়তানের এক শেষ। শয়তান ! শয়তান ! আমাকে গ্রামে টিকতে দিলে না হে ! মেয়েটাকে নিয়ে চিরকাল কলকাতায় কাটাতে হলো। আমার ওই একটি মাত্র মেয়ে।

ব্যাটা বলে কিনা আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে বিষয় সম্পত্তি সব নিয়ে নেবে! কি আস্পর্দ্ধা! কি আস্পর্দ্ধা!'

অনুপস্থিত বটুক বাঁড়ুয্যের উপর অবিনাশবাবুর রাগের কারণটা এতক্ষণে বোঝা গেল। শিবনাথ আশ্বস্ত হয়ে উঠলো। চাকরীটা যদি সত্যিই হ'য়ে যায় তা'হলে বটুককে শায়েস্তা করতে পারুক আর না পারুক, নিজে সে অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে যাবে। চাকরী! এই চাকরীর খোঁজে সে দিনের পর দিন অফিস-পাড়া চষে ফেলেচে, স্থায়ী চাকরী একটাও জোটেনি। আজ সত্যিই কি এখনি যথাচিত, অযাচিত ভাবে—

হঠাৎ দরজার বাইরে ভারতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'হারাধন! হারাধন!' সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে ঢুকলো। অবিনাশবাবু বললেন,'আঃ, তুই আবার কেন?'

ভারতী হারাধনের দিকে চেয়ে বললে, 'ডাকলে শুনতে পাস না বুঝি?'

জবাব দিলেন অবিনাশবাবু, 'পায়, পায়। কাজের সময় ডাকাডাকি করো না। ও এইখানেই থাকবে।' তারপর শিবনাথের দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, শোনো যা বলছিলাম, অনেক কাজ করতে হবে তোমাকে। ভয় পেলে চলবে না।'

—'আজ্ঞে না, ভয় আমি কাউকে করি না।'

ভারতী এই সময় বললে, 'ওঁর জন্যে একজন কাবুলীওলা দাঁড়িয়ে আছে।'

শিবনাথের মুখ শুকিয়ে গেল, সমস্ত সাহস যেন নিভে গেল এক মুহূর্ত্তে। সে কোন কথা বলবার আগেই অবিনাশবাবু বললেন, ,কাবলীওলা? ঘরে ঢুকতে দিও না। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।'

শিবনাথ যেন অকুল সমুদ্রে তীর খুঁজে পেল। কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে বললে, 'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিন, তাড়িয়ে দিন। ভয় আমি কাউকে করি না! হ্যাঁ, চাবকাতে আমি পারব। খুব পারব। লিখুন, লিখুন আমার নাম—'

—'হ্যাঁ, বল।'

অবিনাশবাবু শিবনাথের নাম লিখতে গেলেন, তারপর কাগজের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'আরে, নাম যে একবার লিখেছি হে।'

শিবনাথ বিব্রত ভাবে বললে, 'তা হোক, আবার লিখুন—'

ভারতী এক মুহূর্ত শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। ওর অসহায় অবস্থা দেখে বোধ করি তার মনে সহানুভূতি জাগলো একটু। কোন কথা না বলে সে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে দরজার কাছে কাবুলীওলা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ভারতী নেমে এসে তাকে বললে, 'বাবু এখন আসবে না, তুমি যাও।'

কাবুলী রাজী হলো না, বললে, 'না যাবে না—এই খানে বসবে।'

—'বসবে কি রকম?' ভারতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—'আমাদের দরজায় বসতে পাবে না, যাও। বাবুর বাড়ী জানা নেই?'

কাবুলী জবাব দেবার আগেই উপর থেকে অবিনাশবাবুর গলা শোনা গেল, 'ভারতী, ভারতী—'

ভারতী যাই বলে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

অবিনাশবাবু তখন শিবনাথকে বলছিলেন, 'তা হলে এই কথাই ঠিক রইলো। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে!'

শিবনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

বন্দী

ভারতী ঘরে ঢুকে বললে, 'কি জন্যে ডাকছিলেন বাবা ?'

অবিনাশবাবু শিবনাথকে দেখিয়ে বললেন, 'একেই ঠিক করে ফেললাম। এই পারবে। লম্বা চওড়া জোয়ান, বলছে দু-দিনেই জব্দ করে দেবে ব্যাটাকে।'

শিবনাথ তাড়াতাড়ি বললে, হ্যাঁ, সে আপনি দেখবেন, দু-দিনেই জব্দ করে দেব।'

অবিনাশবাবু উৎসাহিত ভাবে বললেন, 'বাস্, বাস্। বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে চলে এসো। কবে রওনা হতে হবে বলে দেবো।'

শিবনাথ অবিনাশবাবুকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারতী একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলো, 'এ তুমি কি করলে বাবা ?'

—'কি করলাম ?'

—'আজ সকাল থেকে আরও তিন জনকে তো আসতে বললে।'

—'বলেছি বলেই কি সবাইকে নিতে হবে ?'

—'না নিলেও তোমার কথায় বিশ্বাস করে তারা আসবে তো। এমন করে মানুষকে কথা দাও কেন বলতো ? শেষে যখন আর সামলাতে পারবে না, তখন ডাক ভারতীকে। আমি আর পারবো না, তুমি যা খুসী তাই কর।'

ভারতী অপ্রসন্ন মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অবিনাশবাবু ডাকলেন, 'রাগ করে চলে যাসনে মা, শোন্।'

ভারতী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কি শুনবো ?'

—'তাদের বলে দিতে পারবি না যে লোক নেওয়া হয়ে গেছে ?'

—'না, তারা আসুক, এসে তোমায় বিরক্ত করুক।'

—'আরে না, না, সে সব আমি সহ্য করতে পারবো না। ডাক তা হলে ওই ছোকরাটাকেই ডাক—কি নাম যেন, ভোলানাথ না শিবনাথ—'

ভারতী হাসতে হাসতে বললে,—'শিবনাথ।'

—'হ্যাঁ, শিবনাথ। ডাক, তাকেই ডাক।'

ভারতী আর কিছু না বলে তেমনি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এ দিকে নীচে নেমে শিবনাথ তখন দরজার পাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ঠিক সামনেই কাবুলীওলা লাঠি হাতে পায়চারী করছে, মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে দরজার দিকে। শিবনাথের রাস্তায় বার হবার উপায় নেই। কি যে করবে সে কিছুই স্থির করতে পারছে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভারতী ডাকলো, 'শুনুন।'

শিবনাথ চমকে তাকালো সিঁড়ির দিকে। ভারতী বললে, 'কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে?'

অপ্রস্তুত শিবনাথের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কোন রকমে সে বলতে পারলো—'না, কিছু নয়।'

—'কাবলীওলা দাঁড়িয়ে আছে বুঝি?'

শিবনাথ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

—'তবে যে বললেন আপনি কাউকে ভয় করেন না?'

—'না, না, ভয় নয়। ও আমার কাছে টাকা পাবে।'

—'যান, বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

শিবনাথ আরও একটু আশ্চর্য্য হলো, বললে, 'আমাকে? যাচ্ছি। কিন্তু—আপনি—'

ভারতী হাসতে হাসতে বললে, 'আমি, আমি কি ?'

—'আপনি ওরকম করে হাসছেন কেন ?'

—'এমনি।'

শিবনাথ আর কিছু বলবার আগেই উপর থেকে অবিনাশবাবুর ডাক শোনা গেল। শিবনাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ভারতী সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল, কি যেন ভাবলে মনে মনে। তারপব দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কাবুলীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কত টাকা পাবে ?'

কাবুলী বললে, 'পঁচাত্তর রূপেয়া।'

ভারতী বললে, 'দাঁড়াও এইখানে। তোমাব টাকা মিটিয়ে দিচ্ছি।' বলে সে ভেতরে চলে গেল।

অবিনাশবাবু ভেবেছিলেন শিবনাথকেই সাফ জবাব দিয়ে দেবেন। কিন্তু শিবনাথ যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তখন তিনি কিছুতেই সে কথাটা তাকে বলতে পারলেন না। বলতে তো পারলেনই না, উপবন্তু হঠাৎ সেই দীর্ঘদেহ সুপুরুষ ছেলেটীকে তাঁর এত ভাল লেগে গেল যে তিনি তখনই তাকে পাকাপাকিভাবে চাকরীতে বাহাল করে ফেললেন। শুধু বাহাল করাই নয়, এমন ঝোঁক চেপে গেল তাঁর যে শিবনাথকে তিনি আর বাসায় ফিরতেই দিলেন না !

শিবনাথ আপত্তি করলো, কিন্তু অবিনাশবাবুর কাছে সে আপত্তি টিঁকলো না। তিনি বললেন, 'উহুঁ, ওসব কোন কাজের কথা নয়। বাড়ী গিয়ে তোমার মত বদলে যেতে পারে। তার চেয়ে বাড়ীতে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, টাকাকড়ি যা দরকার তাও পাঠিয়ে দাও ওই সঙ্গে। বিকালের গাড়ীতেই আমরা দেশে যাব।'

শিবনাথ পড়লো সমস্যায়। একদিকে অযাচিতভাবে একটা চাকরী পাওয়া অর্থাৎ জীবনে নিশ্চিন্ততার প্রথম সুযোগ। আর একদিকে কমলা, অতুল আর ছোট্ট মেয়েটার জন্যে ভাবনা। কোন্ দিক রাখবে সে? অনেক চিন্তার পর সে স্থির করলো যে, কমলা অতুল আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবেই তার অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজী হওয়া দরকার। নইলে এর-তার কাছে ধার করে, কাবুলীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়ে কতদিন সে দুবেলা দুমুঠো অন্ন ওদের জোগাতে পারবে? তা ছাড়া……

ভারতীর মিষ্টি হাসি, সহানুভূতি-ভরা ছোটখাট কথাগুলি যেন শিবনাথের মনের মধ্যে তার অগোচরেই ইন্দ্রজাল রচনা করছিল।

শিবনাথ অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

বেলা দুটো বাজবার পরও যখন শিবনাথ ফিরলো না তখন ভাতের হাঁড়ি আগলে বসে থাকতে থাকতে কমলা চিন্তিত হয়ে পড়লো।

অতুলও এত বেলা পর্য্যন্ত খায় নি। দাদার অপেক্ষায় বসেছিল।

কমলা এসে বললে, 'ঠাকুরপো, আর কতক্ষণ বসে থাকবে বলতো? যখন হয় আসবে'খন, তুমি আর পিত্তি পড়িও না। স্নান করেছ সেই দু'ঘণ্টা আগে!'

অতুল বললে, 'তা হোক। দাদা আসুক।'

কমলা আর কিছু বলবার আগেই দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

কমলা বললে, 'ওই এসেছে।'

অতুল বললে, 'দাও তো আচ্ছা করে ধমকে। কাজও নেই অবসরও নেই, আচ্ছা মানুষ যাহোক!'

বন্দী

কমলা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে খুলতে বললে, 'কটা বাজলো খেয়াল আছে ?'

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখা গেল যে ব্যক্তি কড়া নাড়ছে সে শিবনাথ নয়, অচেনা একজন। কমলা তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে অতুলকে বললে, 'ত্যাখো তো ঠাকুরপো কে।'

লোকটা ততক্ষণ ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

অতুল উঠে গিয়ে বললে, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে ? ফট্ করে ঘরে ঢুকে পড়লে ? কে তুমি ?'

—'আজ্ঞে আমাকে চিনবেন না, আমি হারাধন।'

—'হারাধন ?'

—'আজ্ঞে হঁ্যা। আপনি বুঝি অতুলবাবু ?'

—'আজ্ঞে—'

ফতুয়ার পকেট থেকে একটা খাম বের করে হারাধন বললে, 'আপনার চিঠি আর এই পঁচিশটে টাকা।'

বিস্মিত অতুল হাত বাড়িয়ে খামখানা নিয়ে বললে, 'কে দিলে ?'

হারাধন জবাব দিলে, 'আজ্ঞে নাম জানি না। সেই যে—লম্বা সায়েবের মতন—দেখুন, পড়ে দেখুন চিঠিখানা।'

কিন্তু চিঠি পড়ার ব্যাপারে অতুল আর কমলা দুজনেই সমান পটু। অতুল খামখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, 'নাও। ত্যাখো আবার কার কাছে ধার করলে।'

হারাধন বললে, 'না, না, ধার করেন নি। দিদিমণি দিয়েছে।'

কমলার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছিল অনিশ্চিত এক আশঙ্কায় ; সে বললে, 'দিদিমণি !'

হারাধন একপাটি দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে, 'আজ্ঞে হিঁ, আমাদেব দিদিমণি।'

অতুল চিঠিখানা নেড়েচেড়ে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলো না ; বিরক্তভাবে বলে উঠলো 'দুর ছাই ! এমন টেনে টেনে লেখে যে একটা লাইন পড়বার জো নেই। কই পড় দেখি তুমি—'

চিঠিখানা অতুল কমলার হাতে দিতে গেল, কমলা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'আমি পড়ব ? তুমি যেন কি ঠাকুরপো—!'

অতুল অপ্রস্তুত ভাবে বললে, 'ও হ্যাঁ। তুমি যে আবার—দরকার নেই বাবা চিঠি পড়ায়। দেখি আমি বাবু আবার কি কাণ্ড করে বসেছেন !'

কমলা বললে, 'ওই যে দিদিমণি না কে তাকেও দেখে এসো ঠাকুরপো।

—'তিনি এতক্ষণ চলে গেছেন।'

—'চলে গেছেন ?'

—'আজ্ঞে হিঁ। বিছানাপত্র বাঁধা হচ্চে দেখে এলুম—'

কমলার মুখ শুকিয়ে উঠলো।

অতুলের কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হোলো না। চাকরী পেয়েছে বলে দাদা যে তাদের ফেলে কলকাতা থেকে চলে যেতে পারে এ কথা সে কল্পনাই করতে পারে না ! আনলা থেকে ছেঁড়া গেঞ্জিটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে অতুল বললে, 'তা হোক বাবা আজ্ঞে হিঁ, চলো যেখানে গেছে সেইখানে যাব। চল দেখি—'

বলে সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে হারাধনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বন্দী

ভাত-তরকারী যেমন রান্নাঘরে পড়েছিল তেমনি পড়ে রইলো। কমলা চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

হারাধনকে সঙ্গে নিয়ে অতুল যখন ভারতীদের বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছল, অবিনাশবাবু তখন ষ্টেশনে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গাড়ীতে উঠে বসেছেন। টিকিট কাটার হাঙ্গামাটা বাকী ছিল বলে একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে তিনি আগেই চলে গেলেন। পিছনে আর একখান গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, ভারতী এসে উঠলো সেটাতে। অবিনাশবাবুর নির্দ্দেশ মত শিবনাথের ওপর পড়েছিল বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্রের সুবন্দোবস্ত করে তালাচাবি দিয়ে আসবার। সে তখনও ভিতরে।

ভারতী গাড়ীতে উঠে বসতেই অতুল দূর থেকে হারাধনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই তোমার দিদিমণি—?'

'আজ্ঞে হিঁ—ওইত।'

'ওই টাকা দিয়েছে?'

'আজ্ঞে হিঁ।'

অতুল কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভারতীকে দেখলো। এত সুন্দরী মেয়ে সে খুব কমই দেখেছে—কমলার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। এগিয়ে গিয়ে কথা কইতে অতুলের ভয় করছিল, তবু সে সাহসে ভর করে কোন রকমে এগিয়ে গেল। তারপর মনে মনে ঠাকুর দেবতাদের স্মরণ করতে করতে বলে ফেললো, 'ঠাকুরুণ, শুনছো?'

ভারতী অবাক হয়ে তার দিকে চাইল, বললে, 'কে?'

অতুল বললে, 'আমাকে চিনবেন না, আমাকে চিনবেন না, এখন আপনি কে তাই শুনি!'

ভারতী বিরক্ত হলো, বিব্রত বোধ করলো খানিকটা। একটু চুপ করে থেকে ডাকলো, 'শিবনাথ বাবু—'

ভিতর থেকে শিবনাথ সাড়া দিল, 'যাই—আমার সব হয়ে গেছে।' মিনিট দুই তিন পরেই শিবনাথ বেরিয়ে এলো। গাড়ীতে উঠে সোজা ভারতীর পাশে বসে পড়লো। অতুলকে সে দেখতে পায় নি।

শিবনাথ বললে, 'একটু দেরী হয়ে গেল বোধ হয়।'

ভারতী সেকথার জবাব না দিয়ে অতুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'দেখুন তো এই লোকটা কি রকম—'

অতুলকে দেখে শিবনাথ বিব্রত বোধ করলো, কিন্তু সে ভাবটা দমন করে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই—তুই এখানে কেন? টাকা পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ' বলে অতুল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো শিবনাথের মুখের দিকে। হাইহিল জুতো পরা পরমা স্থন্দরী ওই মেয়েটীর পাশে দাদার অমন নিঃসঙ্কোচে বসে থাকাটা ভারি অদ্ভুত লাগছিল অতুলের কাছে।

শিবনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'চিঠি পেয়েছিস?'

—'হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু পড়তে পারিনি।'

শিবমাথ একটু চুপ করে থেকে বললে, 'যা। বলে দিস আমি চাকরী পেয়েছি। শীঘ্র ফিরবো।'

ভারতী হারাধনের দিকে চেয়ে বললে, 'তুই দাঁড়িয়ে রইলি কি জন্যে? গাড়ীতে উঠে বস্।'

'আজ্ঞে হিঁ' বলে হারাধন কোচম্যানের পাশে উঠে বসলো। শিবনাথ কোচম্যানকে বললে, 'চলো।'

গাড়োয়ান ছিপটি কশিয়ে দিল ঘোড়ার পীঠে, গাড়ী চলতে সুরু করলো।

'ভারতী অতুলকে লক্ষ্য করে বললে, 'লোকটা কিন্তু ভারি অভদ্র !'

বিব্রত শিবনাথ আরও বিব্রত হয়ে বললে, 'ও এমনিই—ও একটা পাগল, বদ্ধ পাগল।'

অতুলের চোখের সামনে সমস্ত যেন কুয়াশার মত অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সে কোন রকমে ডাকবার চেষ্টা করলো, দাদা ! কিন্তু কথাটা মুখ দিয়ে ভাল বার হোলো না।

গাড়ীটা তার চোখের সামনে দিয়ে অনেক দূরে চলে যাবার পরেও সে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো স্তম্ভিতের মত।

দিন পনের পরের কথা।

শিবনাথ সেই যে গেছে তার আর কোন খোঁজ খবর নেই।

কমলা দিন দুই অতুলকে পাঠিয়েছিল অবিনাশবাবুর বাড়ীতে খবর নেবার জন্যে, কোন খবরই পাওয়া যায় নি। সেদিনও অতুলকে আর একবার খোঁজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে কমলা বারান্দার পাঁচিলে উঠে দড়ি বেঁধে খুকীর জন্যে দোলনা বাঁধবার চেষ্টা করছিল !

অতুল ফিরে এসেই কমলাকে সেই অবস্থায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

—'আহা হা—হা—কর কি !'

অতুলের চীৎকারে সচকিত হয়ে কমলা ঘুরে দাঁড়াল।

অতুল বললে, 'ওখানে উঠেছ কেন ? পড়ে যাবে যে !'

কমলা পাঁচিলের ও-পর থেকেই জবাব দিল, 'না, না, পড়ব না, পড়ব না, ভয় নেই। বস্তির মেয়ে অত সহজে পড়ে মরে না। গিয়েছিলে তোমার দাদার খোঁজে ?'

বন্দী

—'গিয়ে গিয়ে হায়রাণ হয়ে গেলাম। দরজায় তালা বন্ধ, এখনও ফেরেনি।'

—'আচ্ছা লোক যা হোক! কোথায় গেল ঠিকানাটাও নিয়ে রাখতে পারলে না?'

—'ধ্যেৎ তেরি! ঠিকানা নেবে! যাবার সময় পাগল টাগল কত কি বলে দিয়ে গেল—ঠিকানা নেবে!'

কমলা চুপ করে কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, 'আচ্ছা ঠাকুরপো!'

'উঃ!'

'মেয়েটি কি সত্যিই খারাপ?'

'কে জানে! মেয়েরা খারাপ কি ভালো আমি একবার দেখবামাত্র বুঝে নেব! আমি ওসব বুঝতে টুঝতে পারি না। তবে হ্যাঁ, চেহারা একখানা বলতে পারো! হায় হায় হায়, সে যদি তুমি দেখতে বৌঠান! তোমার চেয়ে অনেক ভাল। যেমন গায়ের রং তার, তেমনি—তবে যে রকম উঁচু উঁচু জুতো পরেছিল, সেরকম জুতো যদি তুমি একবার পর বৌদি—একবার পরে দেখবে? তা হলেই বাস্—সড়াক—দুম!'

অতুলের কথা শুনতে শুনতে কমলা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ টাল না সামলাতে পারায় পাঁচিলের ওপর থেকে পা ফস্কে গিয়ে সে পড়লে একেবারে নিচেয়! সঙ্গে সঙ্গে কপালটা ফেটে রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে গেল।

অতুল ছুটলো কমলার কাছে। কমলা তখন অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে! অতুল বললে, 'আচ্ছা হয়েছে! হাজারবার বারণ করলাম, উঠো না, উঠো না। নাও সামলাও এখন! ওঠো।'

বন্দী

কমলার কপালের রক্তটা চোখে পড়তেই অতুল শিউরে উঠলো, বললে—'হুম্! আমি চট্ করে টিন্চার আইডিন নিয়ে আসি ডাক্তারখানা থেকে।'

কমলা মাটীতে ভর দিয়ে একবার ওঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলে না। বললে, 'ঠাকুরপো ধরো, পারছি না—'

অতুল কমলার হাত ধরে নিয়ে এসে কোন রকমে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছুঠলো ডাক্তারখানায়।

কমলা পড়ে রইলো চোখ বুঁজে বিছানার উপর। খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা ভাড়াটে বাড়ী। কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই, সহানুভূতিও না। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু আশপাশের কেউ টের পেল কি না তাও বোঝা গেল না। সাহায্য বা একটু সেবা করবার জন্য এগিয়ে এলো না কেউ। কচি মেয়েটা মেঝেয় পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। কমলার দুচোখ বেয়েও নামলো জলের ধারা। এই একান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে তার মনে পড়ছিল শুধু শিবনাথকে! কি অদ্ভুত মানুষ! সামান্য দু লাইন চিঠি লিখে পাঠিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল, আর কোন খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করলো না। তা হলে কি দরকার ছিল উপযাচক হয়ে তাকে বিয়ে করবার—যদি এতখানি আঘাত আর অবহেলাই হবে তার প্রাপ্য?

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামে ধুমধামের অন্ত থাকে না। বুড়ো শিবতলার আশপাশের খোলা জমিটায় মস্ত মেলা বসে; দশ বিশ খানা গ্রামের লোক আসে পূজো দিতে, গাজনের সন্ন্যাসীদের হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থেকে সম্ভ্রান্ত লোকরা পর্য্যন্ত সবাই আসে পূজো দিতে, প্রণাম করতে।

অবিনাশবাবুও দেশে ফিরে গাজনের দিন ভারতী আর শিবনাথকে নিয়ে বুড়ো শিবতলায় গিয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে দণ্ডীদের ভিড়, কেউ বা ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ বা ব্যোম্ ব্যোম্ আওয়াজ করতে করতে দুহাতে বুক চাপড়াচ্ছে, ব্রতচারীরা আসছে দূর দূরান্তর থেকে কাঁধের ওপর গঙ্গাজলে ভর্ত্তি প্রকাণ্ড এক একটা ঘড়া বা কলসী নিয়ে। মেলার হট্টগোলে কাণপাতাই দায়।

অবিনাশবাবু শিবমন্দিরে গিয়েছিলেন ঠাকুর প্রণাম করতে। ভারতী আর শিবনাথ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র জনসমাবেশ উপভোগ করছিল।

অবিনাশবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ঠিক তাঁর পাশে যে লোকটী প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল সে আর কেউ নয়, বটুক বাঁড়ুয্যে। অবিনাশবাবু চমকে উঠলেন।

বটুক বাঁড়ুয্যে হাসতে হাসতে বললে,—'চমকে উঠলেন কেন চাটুয্যে মশাই? একা এসেছেন, না সঙ্গে আর কেউ আছে?'

অদূরে ভারতী আর শিবনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বটুক আবার বললে, 'বাঃ বেশ জামাইটি হয়েছে! বেশ জামাই।'

শিবনাথ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতেই বটুক বললে, 'না, না, থাক্ থাক্, আমাকে প্রণাম করতে হবে না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না।'

শিবনাথ রুক্ষ কণ্ঠে বললে, 'আপনাকে প্রণাম করতে আসি নি। শুনুন, আমি চাটুজ্জে মশাইয়ের জামাই নই, আমি তাঁর নতুন ম্যানেজার।'

বটুক অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে, 'ভুল করলেন চাটুজ্জে মশাই, আপনার ম্যানেজারের চেয়ে নতুন একটী জামাইয়ের দরকার ছি বেশী।'

ভারতী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাকলো, 'বাবা, চলে এসো। শিবনাথ বাবু—'

শিবনাথ ভারতীর কথায় কাণ দিল না, তার কাণের দুপাশ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠেছিল। বটুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিবনাথ বললে, 'আজ আটদিন হলো আপনাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আপনি আসছেন না কেন ?'

বটুক হো হো করে হেসে উঠলো, বললে, 'বাবাজি, এখন এই গাজনের উৎসব, এখন কি আর আমার—'

শিবনাথ প্রায় ধমকে উঠলো—'থামুন, ওসব কথা শুনতে চাই না।'

—'ওরে বাপরে ! কেন, থামবো কেন ?'

—'আমাকে বাবাজী বাবাজী করবেন না।'

—'যে আজ্ঞে।'

—'কাল সকালে চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীতে আপনি আসবেন।'

—'সকালে ?'

—'হ্যাঁ, সকাল নটায়।'

—'যে আজ্ঞে।'

—'মনে থাকে যেন।'

—'নিশ্চয় ! চাটুয্যে মশায়ের নতুন ম্যানেজার আপনি, আপনার যখন হুকুম—'

বটুক সবিনয়ে একটা নমস্কার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

পরদিন সকাল।

অবিনাশবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে শিবনাথ একা উত্তেজিত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নটার জায়গায় সাড়ে দশটা বেজে গেছে, কিন্তু বটুক

বন্দী

বাঁড়ুয্যে আসে নি। লোকটাকে কি করে জব্দ করা যায় তারই একটা মতলব আঁটতে আঁটতে শিবনাথ ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

বটুকের আগমন আশঙ্কায় অবিনাশবাবু এতক্ষণ পাশের একটা ছোট ঘরে চুপ করে বসেছিলেন। এইবার তিনি সাহসে ভর করে সন্তর্পণে এসে বৈঠকখানা ঘরে উঁকি মারলেন। বটুককে অনুপস্থিত দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'কি বলেছিলাম? এলো? সাংঘাতিক লোক, সাংঘাতিক! আসবে না, আসবে না, আমি জানি।'

শিবনাথ বললে, 'না আসুক, আমি নিজে যাব।'

'তুমি যাবে? একা?'

'কেন, ভয় কিসের?'

'না, না, তুমি জানো না, তুমি চেনো না বটুককে। একা যেয়ো না, খবরদার একা যেয়ো না। চাপরাশী সঙ্গে নিয়ে যেও। নেপাল, নেপাল—কোথায় গেলিরে ব্যাটা—'

'কিছু দরকার হবে না, আপনি ভয় পাবেন না।'

শিবনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবিনাশবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, 'না, না, ভয় নয়। ওরে নেপাল। ভারতী, ভারতী—'

ভারতী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'কি বলছো বাবা?'

—'এই যে! যাতো মা, চট্ করে ওকে ফিরিয়ে আন্, কি করতে কি করে ফেলবে! চলে গেল—একাই চলে গেল ভোলানাথ।'

ভারতী হাসতে হাসতে বললে, 'ভোলানাথ নয় বাবা, শিবনাথ।'

অবিনাশবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, শিবনাথ। আমার খাতায় লেখা আছে।'

ভারতী বললে, 'তা যাক না বাবা, পুরুষ মানুষ তো—যাক না।'

'যাক্ না!···নাঃ, তোরা কিছু বুঝিস না! আমাকেই দেখছি যেতে হলো।' নেপালকে ডাকতে ডাকতে তিনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতী বললে, 'তোমাকে যেতে হবে না বাবা, আমি যাচ্ছি। তুমি বোসো।'

অবিনাশবাবু একটু আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়লেন; হাঁকলেন, 'হারাধন, তামাক দে—'

শিবনাথ সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসছিল, সামনে পড়লো তালপাতার সেপাইয়ের মত অস্থিচর্ম্মসার একটা লোক। শিবনাথকে দেখেই আভূমি প্রণাম করে লোকটা বললে, 'হুজুর।'

বিস্মিত শিবনাথ বললে, 'কে? কে তুমি?'

'আজ্ঞে আমি নেপাল সর্দ্দার। আপনি আমায় চিনবেন না।'

শিবনাথ কিছু বলবার আগেই দেখা গেল ভারতী এসে দাঁড়িয়েছে লোকটার পিছনে। নেপাল সর্দ্দার আবার বললে, 'আমি বহুৎ পুরাণ লোক। জমিদারের চাপরাশী।'

—'চাপরাশী? তুমি চাপরাশী।'

শিবনাথ ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। ভারতী হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ, বাবার চাপরাশী।

ভারতীর হাসিটা নেপালের পছন্দ হোলো না, সে বললে, 'হাসবেন না, হাসবেন না, কি করতে হবে বলুন—দাঙ্গা, মারামারি, খুন জখম—যখন পারব না তখন হাসবেন।'

শিবনাথ হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলে, 'পারবে খুন করতে? বট ককে?

নেপাল বললে, 'হুকুম করে দেখুন। শরীরটে একটু খারাপ হয়ে যাবাও

পর থেকে আর লাঠি ধারণ করি না, অস্ত্র ধারণ করি মা কালীর মত। তা একা বটুককে কেন হুজুর? খুন যদি করতেই হয় তো একা বটুককে কেন? বটুকের মাথাটা—বাস, কুচ্, বটুকের সেই বড় ব্যাটাটা, সেই উকিল—তাকে কুচ্, তারপর ছোট বেটা পড়ে, তাকেও কুচ্—একেবারে গুষ্টিশুদ্ধ কুচ্—' নেপাল এমন অঙ্গভঙ্গী করছিল যাতে মনে হতে পারে সে সত্যি সত্যিই মানুষের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলচে। শিবনাথ আর ভারতী দুজনেই সকৌতুকে তার দিকে চেয়েছিল।

শিবনাথ বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। পরে হুকুম দেব।'

'যে আজ্ঞে হুজুর' বলে নেপাল বেরিয়ে গেল।

শিবনাথও যাচ্ছিল তার পিছনে, ভারতী জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় চললেন?'

'বটুক বাঁড়ুয্যের কাছে।'

'বাবা বারণ করেছেন। আপনি একা যাবেন না।'

'আপনাদের এই নেপাল সর্দ্দারকে সঙ্গে নিয়ে যাব?'

'উপহাস করবেন না।'

'আজ্ঞে না, আপনার সঙ্গে আমার উপহাসের সম্পর্ক নয়।'

'সেটা যেন মনে থাকে।'

ভারতী মিষ্টি একটু হাসলো। শিবনাথ কোন জবাব না দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

ভারতী আবার ডাকলে, 'শুনুন।'

শিবনাথ হাসতে হাসতে ফিরে এল।

'হাসছেন যে?'

বন্দী

'ওই ভাখো—না না, দেখুন।'

আঙুল দিয়ে ভারতীকে সে সিঁড়ির ওপাশের একটা জায়গা নির্দেশ করলো। কিন্তু ভারতী সেটা বুঝতে পারলো না ঠিক, শিবনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি দেখবেন?'

—'আমার মুখে নয়, এই দিকে।'

শিবনাথ আবার সেই দিকটা নির্দেশ করলো। দেখা গেল নেপাল সর্দার একটা মরচে ধরা টাঙ্গি নিয়ে একখণ্ড ঝামাব ওপর ফেলে শান দিচ্ছে।

ভারতী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

শিবনাথ বললে, 'ও সত্যি ভেবেছে বটুককে কাটতে হবে।'

ভারতী কোন রকমে হাসি চেপে বললে, 'হুঁ।'

শিবনাথের আর দেরী করবার উপায় ছিল না, এগারটা বাজে—বটুক এখনও এল না, শিবনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভারতী তাব হাত ধরে ফেলে বললে,-'যাবেন না, বলছি একা যাবেন না—'

শিবনাথ এটা আশা করেনি, সে অবাক হয়ে চাইলো ভারতীর মুখের দিকে। ভারতী কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করলো।

ঠিক সেই সময় পিছন থেকে শোনা গেল বটুকের গলার আওয়াজ: 'নমস্কার।'

শিবনাথ ভারতীর কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার ভয়ানক দেরী হলো।'

বটুক প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার তো মনে হচ্ছে একটু আগেই এসে পড়েছি।'

ইঙ্গিতটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো ; কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে সে বললে, 'বৈঠকখানায় চলুন।'

বৈঠকখানায় ঢুকে শিবনাথ বললে, 'আপনার দেরি কেন হলো বলুন।'

বটুক বেশ শান্তকণ্ঠে বললে, 'দেরী ? তুমি জানো না বাবাজী—না, না, বাবাজী বলবো না, রাগ করবে, ম্যানেজার সাহেব, আপনি শহর থেকে নতুন এসেছেন পাড়াগাঁয়ে, জানবেন কি করে ? এখানকার লোক ঘাড় দেখে চলেও না, ঘড়ি নেইও, এখানে শুধু সূর্য্যি ওঠে আর সূর্য্যি অস্ত যায়। তা আপনি আমায় কি জন্যে তলব করেছেন শুনতে পারি কি ?

বটুক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

শিবনাথ বললে, 'নিশ্চয় পাবেন। এখন বলুন, কেন আপনি এই নিরীহ ভদ্রলোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন ? আপনার জ্বালায় উনি গ্রামে বাস করতে পারেন না তা জানেন ?'

—'জানি, জানি। খুব জানি। তুমি তো দু'দিনের বাবাজী, তুমি—'

—'আবার বাবাজী !' শিবনাথ ধমকে উঠলো।

—ধমকাবেন না, ধমকাবেন না। ওসব জারি জুরি করবার জন্য বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম অনেক প্রজা আপনাদের আছে ; আমি বরং তাদের ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেব—'

—'চুপ করুন। আপনার ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। বলুন কেন আপনি বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ওঁর সঙ্গে এমনি করে ঝগড়া করেন।'

বটুক বললে, 'জানেন না ? শুনুন ! নৌকো যখন প্রথম তৈরী হয় তখন থাকে কোথায় ? ড্যাঙ্গায়। গরুর গাড়ীতে চড়িয়ে তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয় ! তখন গাড়ীকা পলো। তারপর আবার যখন সেই

গরুর গাড়ীকেই নদী পেরোতে হয় তখন সে আবার চড়ে নৌকোর ওপর। তখন নাকা পর গাড়ী। আমাদের ঠিক তাই। একদিন উনি চড়েছেন আমার ওপর, এখন আমি চড়ছি ওঁর ওপর। আমি তখন নিতান্ত ছোট। এই অবিনাশবাবুর বাবা আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করেছিলেন। বড় হয়ে দেখলাম আমি পথের ভিখিরী। তখন তিনি গত হয়েছেন। তাঁর ছেলে এই অবিনাশ চাটুয্যে জমিদার। আমি দেখলাম স্বর্ণ সুযোগ, আমার সম্পত্তি উদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম।'

শিবনাথ বললে, 'হ্যাঁ, চেষ্টা করলেন প্রজা ক্ষেপিয়ে—জোর করে দখল নিয়ে—নিরীহ জমিদারকে অতিষ্ঠ করে তুলে। আদালতে গেলেন না কেন?'

—'খরচ অনেক। আর তার হাঙ্গামাও বড় বেশী। তবে দরকার হলে যাব। বড়ছেলেকে ওকালতি পাশ করিয়েছি সেই জন্যেই।'

—'আর সেই জন্যেই ওই ছেলের সঙ্গে ওঁর মেয়ে ভারতীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?'

বটুক অপ্রস্তুত হলো না, কুণ্ঠিত হলো না। ঠিক তেমনি শান্তভাবে জবাব দিলে, 'চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, চাটুয্যের ওই একটা মাত্র মেয়ে, বৌ হয়ে আমার বাড়ী যদি আসে—ঝগড়া বিবাদ করতে হবে না, সমস্ত সম্পত্তি এমনিতেই ঘরে ঢুকে যাবে। তা যখন হলো না—'

শিবনাথ যেন এতক্ষণে বটুকের সমস্ত শয়তানীর মর্ম্মভেদ করতে পারলো। রুক্ষ কণ্ঠে বললে, 'তা যখন হলো না তখন লাঠি ধরলেন। চমৎকার যুক্তি! আপনাকে—আপনাকে আমি—'

বটুকের গলাটা টিপে ধরবার জন্য শিবনাথের হাত দুটো যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। বটুক বোধহয় সেটা লক্ষ্য করেই বললে, 'মারবেন নাকি?'

শিবনাথ বললে, 'হ্যাঁ মারাই আপনাকে উচিত। আপনাকে বেঁধে চাবুক মারতে পারলে তবে আমার—'

বটুক হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে বললে, 'ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ, নিতান্ত ছেলেমানুষ! চাবুক মেরে জমিদারী শাসনের সে পুরাণ দিন আর নেই। তুমি পারবে না, তুমি পারবে না। তার চেয়ে যা করছিলে তাই করগে, ওইটেই তুমি ভাল পারবে বাবাজী—'

এ বাড়ীতে ঢোকবার সময় যে দৃশ্যটা বটুকের চোখে পড়েছিল সে যে তারই ইঙ্গিত করছে শিবনাথের সেটা বুঝতে দেরী হলো না। শিবনাথ চেঁচিয়ে উঠলো, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে—ছোটলোক, পাজী, শয়তান। তোমার মত লোককে কি করে জব্দ করতে হয় তা আমি জানি।'

বটুকের চেহারা অথবা কথাবার্ত্তায় এখনও কোন উত্তেজনা প্রকাশ পেলনা, সে বেশ ধীরে সুস্থে বললে, 'জানলে অবশ্য ভালই হত। চলেও না হয় আমি যাচ্ছি, থাকবার জন্যে আসিও নি। কিন্তু ভাল কাজ করলে না—'

সবিনয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে বটুক বাড়ুয্যে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শিবনাথ অসহ্য ক্রোধে ফুলতে ফুলতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ভাল কাজ করলে না, ভাল কাজ করলে না! এটা যে বটুকের চ্যালেঞ্জ তার আর ভুল নেই! দেখা যাক, সে কতদূর এগোতে পারে আর তাকে সত্যিই শায়েস্তা করা যায় কি না!

ভারতী আড়ালে থেকে বটুক আর শিবনাথের কথাবার্ত্তার প্রায় সবটাই শুনেছিল, বটুক চলে যাবার পর ঘরে ঢুকে বললে, 'কেন ও লোকটাকে অপমান করলেন? ও বড় সাংঘাতিক মানুষ, আপনি চেনেন না ওকে।'

শিবনাথ বললো, 'অপমান করবো না, কিছু বলবো না—আমাকে তা হলে এখানে আনলেন কি জন্যে শুনি ?'

ভারতী কিছু বলবার আগেই অবিনাশবাবু এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে ঘরে ঢুকলেন, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'চলে গেছে ?'

ভারতী বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু এ রকম অপমান করবার জন্যে ত ম্যানেজারের দরকার হয় না, চাপরাশী দিয়েই চলে।'

শিবনাথভারতীরদিকে চেয়ে বললে, 'তা হলে কি করতেবলেন আমাকে ?'

ভারতী বললে, 'তা জানলে আমিই ম্যানেজার হতে পারতাম।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সব শুনেছি, সব শুনেছি। ও ঘরে বসে বসে আমি সব শুনেছি। আচ্ছা করেছ ভোলানাথ, বেশ করেছ। ব্যাটাকে চাবকালে আমি আরও খুশী হতাম।'

শিবনাথ ভারতীকে বললে, 'নিন্ শুনুন।'

—'আমি মেয়েছেলে, আমি কি শুনবো ? যা খুশী করুন আপনারা !' ভারতী বিরক্ত ভাবে চলে গেল। বটুকের সঙ্গে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনায় সে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছিল—শিবনাথের ভবিষ্যৎ ভেবে। শিবনাথ বা অবিনাশবাবু কেউই সেটুকু বুঝলেন না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ ! ও বলে আমার হাতে সব ছেড়ে দাও বাবা, আমি সব ঠিক করে দেব। পাগলী, পাগলী !'

শিবনাথ বললে, 'না না, পাগলী নয়, পাগলী নয়। আমার এখানে আসাই উচিত হয় নি।'

শিবনাথের কলকাতার বাসায় কমলাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলছিল। পড়ে যাওয়ার দরুণ মাথার সেই ঘা'টা ত সারেই নি, সেই সঙ্গে কয়েকদিন থেকে সুরু হয়েছে জ্বর। বিছানা থেকে ওঠবার উপায় পর্য্যন্ত নেই কমলার, মেয়েটাকে পর্য্যন্ত নিতে পারে না। অতুল অবশ্য প্রাণ দিয়ে বৌদির সেবা শুশ্রূষা করছে, কিন্তু কতটুকু তার সাধ্য আর কতটুকুই বা তার আর্থিক সঙ্গতি! শিবনাথের দেওয়া পঁচিশটা টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে, এখন চলছে দেনার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তাতেই বা কতদিন চলে? কমলার ওষুধ পথ্য আছে, ছোট্ট মেয়েটার দুধ আছে—নিজের দুবেলা দুমুঠোর কথা না হয় ছেড়েই দিল অতুল!

দিন যে কি করে কাটছিল তা ভগবানই জানেন; তার ওপর সেদিন সকাল থেকে কমলার জ্বরটা আবার বেড়ে উঠলো। অতুল ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। রোগীর ক্ষতস্থান আর নাড়ী পরীক্ষার পর ডাক্তারের মুখ হয়ে উঠলো গম্ভীর।

অতুল ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রকম দেখলেন স্যার?'

ডাক্তার আগে দুদিন ভিজিট পান নি, একটু বিরক্ত ভাবেই বলে উঠলেন, 'কি রকম দেখলেন স্যার! হাজার বার সেই এক কথা! কি রকম দেখলেন স্যার, কি রকম দেখলেন স্যার! বাঁচিয়ে দিতে হবে স্যার! আমরা কি ভগবান যে বাঁচিয়ে দেব!'

সন্ত্রস্ত কণ্ঠে অতুল বললে, 'চুপ করুন স্যার, চুপ করুন। সত্যি বাঁচবেনা?'

—'বাঁচবে কি মরবে ভগবান জানেন। তোমাকে সেদিন যে ইন্‌জেকশানটার কথা বলেছিলাম তার তো কোন ব্যবস্থাই করলে না। যাও চট্ করে ওটা নিয়ে এসো।'

অতুলের মুখ শুকিয়ে গেল, একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দাম কি ওই লাগবে ?'

—'হ্যাঁ, বার টাকা।'

—'কমে হবে না ডাক্তারবাবু ? আমার দাদা এখনও—'

—'না, না, কমে হবে না। আজকাল যুদ্ধের বাজার। তুমি ওটা নিয়ে এসে আমায় খবর দিও। আজই ইন্‌জেকশান দেওয়া চাই।'

ডাক্তার চলে গেলেন। অতুল তাঁকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যে। শিবনাথের মেয়েটা ঘুমুচ্চে। কমলাও বিছানার উপর পড়ে আছে আচ্ছন্নের মত। তাকে বাঁচাতে হলে আজই ইন্‌জেকশানের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু টাকা কোথায় ? এক সঙ্গে বারটা টাকা কে দেবে তাকে এখুনি ? অতুল আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো, কিন্তু কোন সদুপায়ই তার মনে পড়লো না। কেটে গেল কিছুক্ষণ।

অতুল কমলার কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বৌদি !'

কমলার সাড়া পাওয়া গেল না। অতুল আবার ডাকলো, 'বৌদি !'

নাঃ, কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা হাত বুকের ওপর, আর একটা হাত এলিয়ে পড়েছে বিছানার পাশে। বেঁচে আছে কি না বোঝবার উপায় নেই। কমলার হাতের চুড়ি গাছটার ওপর চোখ পড়লো অতুলের। অতুল আরও দু পা এগিয়ে গেল। নাঃ, এ ছাড়া কোন উপায় নেই। অতুল সন্তর্পণে চুড়িগাছটা খুলে নিল। বুকের ভিতরটা কাঁপছিল উত্তেজনা আর আশঙ্কায়। সে আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না।

চুড়িগাছটা হাতে নিয়ে একেবারে স্যাকরার দোকানে।

বন্দী

স্যাকরা কষ্টিপাথরে চুড়িটা একবার ঘষে নিয়ে দেখলো ; তারপর মুখ তুলে বললে, 'হুঁঃ। এই চুড়ি বিক্রী করতে এসেছেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি করে নিন দাদা, একটু তাড়াতাড়ি। —বড্ড দরকার।'

—'বড্ড দরকার ?' বলে স্যাকরা একবার অতুলের মুখের দিকে চাইলো, তারপর বললে, 'তাত হবেই। এটা ত সোনা নয়, গিল্টি।'

'গিল্টি !'

অতুলের মুখ দিয়ে আর কথা বার হলো না, সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো স্যাকরার মুখের দিকে।

স্যাকরা চুড়ি গাছটা অতুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে : 'যান, সরে পড়ুন। অন্য লোক হলে পুলিসে দিতাম।'

অতুল নিঃশব্দে উঠে এল দোকান থেকে। হাতে সেই চুড়ি গাছটা। সোনা নয়, গিল্টি ! গিল্টি ! অতুলের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু স্যাকরা কষ্টি পাথরে কষে দেখেছে। আর কিছুই বলবার নেই। এখন কোথায় যাবে অতুল ? কি করে সংগ্রহ করবে ইন্‌জেকশানের ওষুধটা ? রাস্তা দিয়ে ট্রাম, গাড়ী ঘোড়া, মোটর লরী ছুটছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, অতুলের মনে হলো ওদের কোনটার তলায় চাপা পড়তে পারলে এ যাত্রা সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলা যেত। নইলে আর কোন উপায়ই ত তার নেই !

শিবনাথ ঝোঁকের মাথায় এবং কতকটা চাকরীর লোভে অবিনাশবাবুর সঙ্গে এসে পড়লেও কদিন ধরেই সে মনের মধ্যে বিষম একটা অস্বস্তি

বোধ করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, কলকাতায় কিছু একটা অনর্থ ঘটেছে, এখানে এমন করে বসে থাকা আর উচিত নয়। সেখানে কিছু টাকা পাঠানও দরকার, কিন্তু পূরো একটা মাস শেষ হবার আগে টাকা চাওয়াই বা যায় কি করে? তা ছাড়া দু' মাসের মাইনে ত সে গোড়াতেই নিয়ে রেখেচে। টাকার কথা সে এঁদের বলবে কোন মুখে?

শিবনাথের মনের এই অস্বস্তির ভাবটা ভারতীর চোখ এড়ায় নি। সেদিন সে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে বসলো, 'আপনার কি ব্যাপার বলুন তো? মনে হচ্ছে এখানে এসে বিষম অস্থবিধেয় পড়ে গেছেন। আসল কথাটা আমায় বলুন তো দয়া করে?'

শিবনাথ বললে 'আপনারা দয়া করে আমায় ছুটী দিন, আমি চলে যাই। বাস, আর কিছু চাই না।'

ভারতী একটু হাসলো, তারপর বললে, 'আপনাকে ছুটী দেবার মালিক আমি নই। ছুটী বাবার কাছে নেবেন।'

শিবনাথ আবার বললে, 'আমি জমিদারী শাসন করতে জানিনা, বটুক বাঁড়ুয্যেকে জব্দ করতে হলে অন্যরকম ভাবে করতে হবে। আমি কাবলি ওলার ভয়ে আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়েছিলাম, হটাৎ চাকরীটা পেয়ে গেলাম। আমি মিথ্যেবাদী, আমি জোচ্চোর, আমি—'

ভারতী বাধা দিয়ে বললে, 'চুপ করুন, চুপ করুন। আমি এসব কথা আপনাকে বলিনি। আপনি নিজে বলেছেন।'

—'বলা আমার উচিত হয় নি।'

ভারতী রেগে উঠলো, বললে, 'তা বেশ তো। যাব যাব বলে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? যাবার ইচ্ছে হয় যাবেন, কে আপনাকে ধরে রেখেছে?'

—'কে আমাকে ধরে রেখেছে !'

—'হ্যাঁ, বাবার কছে যান, গিয়ে কাজে ইস্তফা দিন, তারপর যেখানে আপনার মন পড়ে আছে সেখানে চলে যান '

ভারতী কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে, মনে হলো, সে কান্নার আবেগ চাপবার চেষ্টা করছে ।

শিবনাথ বললে, 'আপনার বাবাটি যে ইস্তফা নিতে চাইছেন না ।'

ভারতী কিছু বলবার আগেই পাশের ঘর থেকে অবিনাশবাবুর গলা শোনা গেল, 'শিবনাথ ! শিবনাথ—'

ভারতী বললে, 'যান' বাবা আপনাকে ডাকছেন ।'

শিবনাথ অবিনাশবাবুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলো, 'ডাকছিলেন ?'

অবিনাশবাবু উৎফুল্ল মুখে বললেন, 'হ্যাঁ । বটুক জব্দ হয়ে গেছে— একদম জব্দ হয়ে গেছে ।'

পাশেই একটী লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'এই ছাখো, এই লোকটির হাতে চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে । রাত্রে আজ চোত-পরবের সং হবে কি না, তাই—কি লিখচে শোন—'

বলে তিনি চিঠিখানা খুলে পড়তে স্বরু করলেন :

প্রণাম শতকোটি—একটি দুটি নয় কোটি কোটি—নিবেদনমিদং আপনি আজ সপরিবারে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিলে আমরা আনন্দিত হইব । ভাল বাংলা লিখেছে হে, নাটশালাকে লিখেছে উৎসব উঠোন । আমরা ছোটবেলায় দেখেছি সারা রাত ধরে সং চলতো । গাঁয়ের যত লোকের কুচ্ছো গাওয়া হতো । হ্যাঁহে—ও—তোমার নামটি যে ভুলে যাচ্ছি ।

লোকটি বললে, 'গোবর্দ্ধন।'

—'হ্যাঁ, গোবর্দ্ধন। বলি গানটান বাঁধা হয়েছে?'

—'অনেক। কঙ্কনার মেলায় একজন মাদুর চুরি করে ধরা পড়েছিল। তার গানটা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। শুনবেন?'

শিবনাথ বললে, 'না, থাক। তুমি কোন্ দলের লোক?'

—'দল? আজ্ঞে দল তো ঠিক—'

অবিনাশবাবু বললেন, 'না হে না, ও আমাদের জ্ঞাতি সম্পর্কে নাতি হয়। নাতি সায়েব, নাতি সায়েব। ও আমাদের দলে।'

শিবনাথ তবু বিশেষ উৎসাহিত হলো না, বললে, 'শোনো। আমাদের নামে যদি কিছু কেলেঙ্কারী করে তো তখুনি আমায় জানিয়ে দিও। পারবে ত?'

গোবর্দ্ধন বললে, 'কেন পারবো না, নিশ্চয় পারবো। তা হলে আমি আজ চলি।'

শিবনাথ বললে, 'আচ্ছা এসো।'

লোকটা কিছু দূর গিয়েই ইসারা করে শিবনাথকে ডাকলে। শিবনাথ কাছে যেতেই সে বললে, 'দেখুন, ডেকে দেওয়া আমার হবে না, আপনি নিজেই একবার যাবেন শিবতলায়।'

'কেন বলতো?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো শিবনাথ।

গোবর্দ্ধন বললে, 'এই একটু গান টান হবে।...ভরসা দেন তো বলি—'

'বল।'

'আপনার নামেও হবে। বটুক গান বাঁধিয়েছে। নিজে গিয়েই শুনে আসবেন।'

ব্যাপারটা রীতিমত কৌতূহলজনক হয়ে উঠছে। শিবনাথের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। খানিক চুপ করে থেকে সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি যাও।'

গোবর্দ্ধন চলে গেল।

ভারতী ঠিক এই সময় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, শিবনাথ তা লক্ষ্যই করেনি। গোবর্দ্ধন চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কার সঙ্গে কথা কইছিলে?'

'ও—হ্যাঁ, ওই লোকটার সঙ্গে।'

তাড়াতাড়ি কথাটা বলেই শিবনাথ চলে গেল। ভারতীর দিকে চাইতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল ; বটুক বাঁড়ুয্যের ওপর অদ্ভুত একটা আক্রোশে জ্বলে যাচ্ছিল তার সর্ব্বাঙ্গ।

শিবতলায় গানের আসরটা জমেছিল ভাল, বটুক বাঁড়ুয্যে আয়োজনের কোন ত্রুটী রাখেনি। মন্দিরের সামনের খোলা জায়গাটায় ফরাস বিছিয়ে, সামিয়ানা খাটিয়ে আশ-পাশের দু-পাঁচটা গাঁয়ের লোক পর্য্যন্ত জড় করতে সে চেষ্টার কসুর করেনি। প্রথমে জন দুই লোক উঠে কঙ্কনার খেলায় সেই মাদুর চুরীর ব্যাপার নিয়ে একটা ছড়া কাটতে আরম্ভ করলো।

তামাসার মাঝখানে তাকিয়ে ঠেশন দিয়ে বসে বটুক মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে তার মাঝে মাঝে গোঁফ জোড়ার প্রান্তভাগ মোড়াতে মোড়াতে উপভোগ করছিল সেই গান। লোক দুটী নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে গাইতে লাগলো।

বন্দী

শোনো ভাই শোন সবে শোনো দিয়া মন,
সন তেরস তিরিশ সালের অপূর্ব্ব কথন।
গালাগাল দিলেও আজ রাগ করো না ভাই,
বুড়ো শিবের গাজন তলায় রাগ করিতে নাই,
দাদা রাগ করিতে নাই।
মস্তগুণী সুরধুনী মুখুয্যেদের স্ত্রী
কঙ্কনাতে মেলার রাতে করলে মাদুর চুরি।
ছি ছি করে সমস্বরে মেলার যত লোক,
ধিঙ্গি মেয়ে রইলো চেয়ে, বললে যা হয় হোক।
আর কোথা যায় ধরলে সবাই ঢাললে মাথায় ঘোল,
চোখের জলে নাকের জলে ভাঙ্গলে জারি জুরি।

অশিক্ষিত চাষা ভুষোর দল হেসে লুটিয়ে পড়লো। বটুক বাঁড়ুয্যে পর্য্যন্ত তালে তালে পা দোলাতে লাগলো।

লোক দুটি আবার স্বরু করলে।

আরও আছে বলি শোনো, শোনো মহাশয়,
আর একটী মেয়ে সে এই গ্রামেতেই রয়।
কালে কালে দেখবো কত বলবো কত ভাই,
কলেজে পড়া গাঁয়ের মেয়ে বলতে কিছু নাই।
খট্ খটা খট্ পথ চলে যে, কি সে জুতোর ঠেলা,
আমি বলি হে নারায়ণ, পথ দাও এই বেলা।
জমিদারের সাধের মেয়ে বলার আছে ভয়,
বলব তবু গাজন তলায় গুণের পরিচয়।

নামটী শুধু কইবো নাকো, কইতে আছে মানা,
আকারে ইঙ্গিতে হবে সবই টেনে আনা।
হয়নি বিয়ে কুমারী সে বলবো কত আর
চ্যাংড়া ছোঁড়ার হাতটী ধরে চলার কি বাহার।

বটুক ক্রমেই আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল, এবার সে হাঁকলে, আরে, এবার সেই নতুন গানটা ধর হে—

লোক দুটি তখনই আরম্ভ করলে।

ডুবলো রে গাঁ নতুন পাপে
মান বাঁচানো দায়।
মন কাঁদে আজ মনস্তাপে,
কি হবে উপায়!
জমিদারের ধিঙ্গি মেয়ে,
গাঁয়ের মাথা দিলে খেয়ে,
শুধু কি সব দেখ্‌বি চেয়ে,
রইবি নিরুপায়?
রং মেখেছে সং সেজেছে
কলকাতাতে গিয়ে,
ফিরলো গাঁয়ে পায়ে পায়ে
মন্দ জোয়ান নিয়ে।
(ওদের) হয়নি শুনি বিয়ে।
নাম ম্যানেজার, নাইকো বিচার,
মজায় কুলমান,

বন্দী

জানে সবাই বিশ্বাস নাই,
আওার আর বি-এ,
দাদা আশু সে আর বিয়ে।

গান শুনতে শুনতে সবাই এতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল যে শিবনাথ কখন সেই ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে দিকে কেউ লক্ষ্যই করে নি, বটুক পর্য্যন্ত না। গানের শেষ কটা লাইন শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে মাথায় উঠে গেল, স্থান কাল পাত্র কোন কিছুরই ঠিক রইলো না তার কাছে। আসবার সময় শিবনাথ একটা রিভলভার নিয়ে এসেছিল সঙ্গে, কি জানি যদি কোন রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে তা-হলে আত্মরক্ষার সুবিধা হতে পারে—এই সব ভেবে। পকেটের মধ্যে রিভলভারটাকে হাতে করে চেপে ধরে শিবনাথ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল আসরের মাঝখানে। তারপর কঠিন কণ্ঠে ডাকলো, 'বটুক বাবু।'

লোকজন হাঁ করে চেয়ে রইলো শিবনাথের দিকে, যারা গান গাইছিল তারা নিঃশব্দে আসরের এক কোণে বসে পড়লো, বটুকও তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল শিবনাথের কাছে।

শিবনাথ গর্জ্জে উঠলো, 'কি হচ্ছে এ সব ?'

বটুক নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল, 'আনন্দ !'

—'এই আপনাদের আনন্দ ?'

—'হ্যাঁ, এই আমাদের আনন্দ ! সারা বছর ধরে গ্রামে গোপনে গোপনে যে সব কেলেঙ্কারী হয়—'

—'চুপ করুন।'

—'মারবে নাকি ?' ব্যঙ্গকণ্ঠে কথাটা বলে বটুক একবার মাতব্বরের মত আশপাশে তার সমর্থকদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো।

শিবনাথ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললে, 'আপনার মত লোককে গুলী করে মারাই উচিত।'

বটুক দমলো না, তেমনি বিদ্রূপের স্বরে বললে, 'গুলী করার হাঙ্গামা যে অনেক। একবার চেষ্টা করে ছাখো না বাবাজী!'

বাবাজী কথাটা শোন্‌বার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো। বটুকের একটা হাত সজোরে চেপে ধরে শিবনাথ বললে, 'হ্যাঁ তাই দেখবো, শয়তান, এসো তুমি আমার সঙ্গে।'

বটুকের হাত ধরে টানতে টানতে শিবনাথ তাকে আসরের বাইরে নিয়ে এলো। দেখতে দেখতে লোকজন ভিড় করে দাঁড়ালো তাদের দুজনের চারি পাশে। ইতিমধ্যে কে একজন বটুকের বাড়ীতে গিয়ে বড় ছেলেকে খবর দিয়ে এসেছিল। সে ছুটতে ছুটতে এসে ডাকলো, 'বাবা, বাবা!'

বটুক বললে, 'আঃ, তুই আবার এলি কি জন্যে ?'

বটুকের ছেলে বাপের কথার জবাব না দিয়ে শিবনাথের হাত থেকে বটুককে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'হাত ছাড়ুন শিবনাথবাবু, হাত ছাড়ুন।'

—'না, ছাড়বো না। ক্ষমতা থাকে ছাড়িয়ে নাও।'

—'ছাড়ুন বলছি শিবনাথবাবু।'

—'না ছাড়বো না।'

—'ছাড়ুন।'

—'না।'

শিবনাথ ইতিমধ্যে এক সময় পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে হাতে নিয়েছিল। বটুকের ছেলে হঠাৎ সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'তবে রে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি—'

রিভলভারটা সে শিবনাথের বুকের সামনে উঁচু করে ধরলো।

এমন সময় দেখা গেল—ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে ভারতী। এই বিরাট জনতার কারও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, তার লক্ষ্য শুধু শিবনাথের দিকে। শিবতলায় গোলমাল সুরু হয়েছে খবর পেয়েই শিবনাথের বিপদ আশঙ্কা করে সে ছুটে এসেছিল এত লোকের মাঝখানে। বটুকের ছেলের হাতে রিভলবার দেখেই ভারতীর মুখ শুকিয়ে গেল, সে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকলো, 'শিবনাথ বাবু, সরে আসুন, চলে আসুন—'

শিবনাথ কিন্তু নড়লো না, বললে, 'না, আমি যাব না।'

ভারতীর আর কিছু ভাববার সময় ছিল না, সে উন্মত্তের মতো বটুকের ছেলের হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিতে গেল। বটুকের ছেলে রমানাথও না ছোড়বন্দ! দুজনের কাড়াকাড়ির মধ্যে শিবনাথও এগিয়ে গেল ভারতীকে সাহায্য করতে, আশপাশের দু-চার জন লোক নিলে রমানাথের পক্ষ আর সেই গোলযোগের মধ্যে রমানাথের হাত থেকে রিভলভারটা গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা শব্দ, গুলী ছুটে গেছে রিভলভার থেকে; পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল—রমানাথ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছে, গুলীটা বিঁধেছে গিয়ে তারই দেহে!

মিনিট দু'য়ের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। লোক জনের কেউ বা

পালালো উর্দ্ধশ্বাসে, কেউ ছুটে গেল রমানাথের রক্তাক্ত দেহটা দেখ্‌বার জন্য। স্তম্ভিত বটুক দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মত, ভীষণ, নিষ্ঠুর একটা সঙ্কল্পে তার চোখ দুটো উঠলো জ্বলে, বটুকের ছোট ছেলেটা রমানাথের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগলো, 'দাদা! দাদা!'

সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শিবনাথ বা ভারতীর দিকে লক্ষ্য করবার অবসর ছিলনা কারও। শিবনাথ ভারতীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ভিড়ের বাইরে। হঠাৎ যাতে কারও চোখ না পড়ে সে জন্যে অন্ধকার একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। হারাধন চাকর এসে চল ভারতীর সঙ্গে, সেও এসে দাঁড়াল গাছতলায়।

ভারতী শিবনাথকে বললে, 'কেন আপনি এটা নিয়ে এলেন? রিভল-ভারটা কেন আনলেন আপনার সঙ্গে?'

শিবনাথ কি বলবে কিছুই স্থির করতে পারছিল না; ভারতী হারাধনকে বললে, 'বাবাকে বলবি, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, রাত্রির ট্রেণেই। বাবাকে নিয়ে তোরা পরে আসবি।'

শিবনাথ বললে, 'কলকাতায়? কেন?'

—'হ্যাঁ, চলুন, আমি আর ভাবতে পারছি না।'

—'তুমি কি বলছ ভারতী?'

—'আমার কথা শুনুন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

—'কিন্তু—পালাব কেন?'

—'হ্যাঁ, পালাব—আমরা দুজনেই পালাব। বটুককে আপনি চেনেন না। সে আপনাকে সহজে ছাড়বে না।'

বন্দী

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে শিবনাথকে নিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরলো।

ভারতী কথাটা মিছে বলেনি। রমানাথ সেই দুর্ঘটনার ঘণ্টা দুই পরেই মারা গেল আর বটুক বাড়ুয্যে সঙ্গে সঙ্গে থানায় এই বলে অভিযোগ দায়ের করলে যে অবিনাশবাবুর ম্যানেজার গুলী করে খুন করেছে তার ছেলেকে। গ্রাম অঞ্চলের দারোগাবাবুরা পয়সাওলা লোকদের হাতধরা, কাজেই সেদিক থেকে বটুকের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। আর সাক্ষী সাবুদ? সে ত বটুক বাড়ুয্যের হাতের পাঁচ। সুতরাং সেই রাত্রেই পুলিশের তদন্ত সুরু হয়ে গেল।

অবিনাশবাবু হারাধনের মুখে খবর পেয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর হাত পা ঠক-ঠক করে কাঁপছিল। পরদিন প্রথম ট্রেণেই কলকাতায় চলে যাবেন ঠিক করে তিনি হারাধনের সাহায্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলেন, এমন সময় পুলিশ এসে চড়াও হল তাঁর বাড়ীতে।

অবিনাশবাবুর হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠলো।

ইনস্পেক্টর তাঁর ঘরে ঢুকতেই অবিনাশবাবু বললেন, 'হে ভগবান, হে ভগবান, আমি কিছু জানি না।'

ইনস্পেক্টার ধমকে উঠলো, 'আসামীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'আসামী! কে আসামী?'

'আপনার ম্যানেজার। কোথায় সে বলুন।'

'কলকাতায় বোধ হয়!......না, না, আমি জানি না, আমি তো জানি না।'

'জানেন না ? তাই আপনিও যাবার জন্যে স্যুটকেশ গোছাচ্ছিলেন ? হু: । এখন আপনার ম্যানেজারের নামটা বলুন তো ।'

'ম্যানেজারের নাম ? শম্ভুনাথ না ভোলানাথ···দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার খাতায় লেখা আছে । হারাধন, বাবা, দে খাতাটা দে চট্ করে—'

হারাধন বললে, 'আজ্ঞে আমার মনে আছে'। ম্যানেজার বাবুর নাম—শিবনাথ মুখুয্যে ।'

'বাড়ী ?'

'আজ্ঞে, একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তার নাম মনে নেই ।'

ইনস্পেক্টার অবিনাশবাবুকে বললেন, 'আপনার বাড়ীর ঠিকানা কি ?'

'সতের নম্বর—নীলমণি সরকার লেন ।

'ব্যস্, তাতেই হবে । আসুন ।'

অবিনাশ বিস্মিত এবং ততোধিক ভীত হয়ে বললেন, 'কোথায় ?'

ইনস্পেক্টার বললে, 'আমাদের সঙ্গে ।'

অবিনাশবাবু প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি ! সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'না, না, সে কি করে হয় ! আমি যে কলকাতায়—'

ইনস্পেক্টার বললে, 'সে জন্যে ভাববেন না । কলকাতার ব্যবস্থা আমরাই করবো ।'

কমলার ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে গিয়ে পচ ধরেছিল, অতুল তবু ইনজেক্শানের কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি । কমলার অবস্থাটা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে চলেছিল মৃত্যুর দিকে । নিরুপায়

অতুল মাঝে মাঝে অবিনাশবাবুর বাড়ীর সামনে এসে বন্ধ দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে আশা করে, হয়ত বা এত দিনে তারা ফিরে এসেছে, অন্ততঃপক্ষে কোন চাকর-বাকরও যদি আসে, তাদের কাছেও একটা খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে আশা কোন দিনই পূর্ণ হয় না।

সেদিন কিন্তু অতুল অবিনাশ বাবুর বাড়ীর সামনে পৌঁছে নিজের চোখ দুটোকেই যেন হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারলে না। বাড়ীর বাইরে কোন লোকজন নেই, কিন্তু দরজার তালাটা খোলা। নিশ্চয় কেউ এসেছে। কিন্তু কাকে ডাকবে অতুল? বাড়ীর মালিকের নামটাও তো তার জানা নেই। অনেক ভেবে সাহসে ভর করে অতুল ডাকতে লাগলো, 'দাদা! দাদা!'

শিবনাথ আর ভারতী ঘণ্টা দুই আগে এসে পৌঁছেছিল। রাত্রে ট্রেণে খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নি। ভারতী নিজেই ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা-হালুয়া তৈরী করলে। খাওয়ার পালা চুকিয়ে শিবনাথ উকীলের পরামর্শ নেবার জন্য বাইরে যাবার উপক্রম করছিল। এমন সময় শোনা গেল অতুলের ডাক।

শিবনাথকে বাইরে যেতে দেবার ইচ্ছে ভারতীর মোটেই ছিল না। সে বললে, 'আপনি যাবেন না শিববাবু, আমি নিজে যাব উকীলের বাড়ী। শুনুন।'

শিবনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'কে যেন ডাকলে আমায়!'

—'না, কেউ ডাকেনি। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি—'

ভারতী তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। শিবনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। অস্পষ্ট ভাবে শোনা অতুলের ডাকটা তখনও কানে বাজছিল। নিশ্চয়ই অতুলের ডাক, কিন্তু অতুল এরি মধ্যে খবর পেলে কি করে? কোন বিপদ ঘটেনি ত ওদের?

বাইরে থেকে আবার অতুলের গলা শোনা গেল, দাদা!

নিশ্চয় অতুল, তাতে আর ভুল নেই। শিবনাথ তাড়াতা'ড় নেমে গিয়ে দবজাটা খুলে ফেললো। সামনে দাঁড়িয়ে অতুল; চুলগুলো এলো-মেলো, পরণে ছেঁড়া কাপড়, চোখের কোলে কালী পড়েছে। অতুল বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে, 'দাদা!'

শিবনাথ বললে, 'কিরে, অমন করছিস কেন? আয় ভেতরে আয়।'

—'ভেতরে যাবার সময় নেই, তুমি এসো।'

অতুল শিবনাথের হাত ধরে টানতে লাগলো।

—'ব্যাপার কি বল্‌তো? কি হয়েছে?'

—'বৌদির খুব অসুখ। তুমিতো বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে--এদিকে—'

—'এখন কেমন আছে?'

—'বিশেষ ভাল নয়। সে যাই হোক্‌, তুমি এসে পড়েছ, আমি বাঁচলাম। চলো চলো—'

শিবনাথ আর কিছু ভাববার অবসর পেল না, অতুলের সঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

এাদকে ভারতী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো সিঁড়িতে শিবনাথ নেই, দরজাটা খোলা। নিশ্চয় শিবনাথ বেরিয়ে গেছে। ভারতী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো।

দরজার কাছে এসে ডাকলো, 'শিবনাথবাবু—'

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টার আর দুজন কনেষ্টবলকে। ইনস্‌পেক্টার ভারতীর সামনে এসে বললে, 'কোথায় শিবনাথবাবু?'

ভারতী যখন শিবনাথকে ডাকছিল তখন তারা সেটা শুনতে পেয়েছিল।

মুহূর্ত্তের জন্য ভারতীর মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু সে বিচলিত হ'ল না, বললে, 'জানিনা, ভিতরে খোঁজ করে দেখুন।'

ভারতী আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ভারতীর কথায় বিশ্বাস করলে না; কনেষ্টবল দুজনকে ভারতীর পিছনে পিছনে যাবার নির্দ্দেশ দিয়ে নিজে ঢুকল গিয়ে বাড়ীর মধ্যে।

অতুলের পিছনে নিজেদের সেই ভাড়াটে বাড়ীতে ঢুকতে শিবনাথের বুক কাঁপছিল। কি আশ্চর্য্য। এত দিন সে এদের ভুলে ছিল কি করে, কার জন্যে?

অতুল বারান্দায় পা দিয়েই চেঁচাতে স্থরু করলো, 'বৌদি, বৌদি, এই ছাখো কাকে ধরে নিয়ে এসেছি—'

ঘরে ঢুকেই অতুল এবং তার পিছনে শিবনাথ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কমলার মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেছে, হাত দুটো চৌকী থেকে বেরিয়ে মেঝের দিকে এলিয়ে পড়েছে।

অতুল বিছানার কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বৌদি, বৌদি—'

কিন্তু কে শুনবে সে ডাক? কমলা তখন পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বাইরে। ছোট মেয়েটা মেঝেয় পড়ে কাঁদছে—রোজকার মত। অতুলের অনুপস্থিতির সময় কমলা বোধহয় তাকেই থামাবার জন্যে বিছানা থেকে ওঠবার চেষ্টা করেছিল, আর সেই মুহূর্ত্তেই বোধহয় তার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতাটুকুও গেছে ফুরিয়ে।

অতুল কমলার সেই বিবর্ণ, পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো, তার দুচোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। শিবনাথের মাথাটা শুধু নীচু হয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশে যেতে চাইলো।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছিল?'

ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে অতুল যেন ফেটে পড়লো: 'আর তো জানবার কিছু দরকার নেই, তুমি যেতে পার দাদা। আর আমি কখনও তোমাকে খুঁজতে যাব না, কখনও খুঁজবো না।'

শিবনাথ কিছুই বলতে পারলো না, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ছোট মেয়েটার দিকে।

অতুল আবার বললে, 'তুমিই ওকে মেরে ফেললে দাদা, ওকে খুন করলে।'

কি জবাব দেবে শিবনাথ? কমলার এই অচিকিৎসা এবং অকাল মৃত্যুর দায়িত্ব সে এড়াবে কি করে? অবিনাশ বাবুদের দেশে থাকার সময় কাদিন থেকেই সে মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিল সত্যি কিন্তু জোর করে চলে আসতে পারলো না কেন? তা হলে এত বড় শোচনীয় ব্যাপারটাও কিছুতে ঘটতো না, আর বটুক বাঁড়ুয্যের ছেলের মৃত্যুর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে হতো না এমন করে।

বন্দী

বাইবে থেকে ভারতীব ডাক শোনা গেল, 'শিবনাথবাবু! শিবনাথবাবু—'

অতুল বললে, 'ওই তোমাকে কে ডাকছে। যাও। হ্যাঁ, তুমি যাও। সেই ভাল।'

শিবনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দেখলে সত্যিই ভারতী দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। শিবনাথ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না। তাবপর বললে, 'ভারতী তুমি এসেছ—?'

কনষ্টেবল দুজন এবং ইনস্‌পেক্টার নিজেও ভারতীর পিছনে পিছনে এসে একটু তফাতে অপেক্ষা করছিল। ভারতী কিছু বলবার আগেই ইনস্‌পেক্টার এগিয়ে এসে বললে, 'উনি একা আসেন নি, আমরাও এসেছি। বেরিয়ে আসুন।'

শিবনাথ দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

ইনস্‌পেক্টার বললে, 'আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।'

শিবনাথ বললে, 'জানি। কি কবতে হবে বলুন।'

ইনস্‌পেক্টার শিবনাথের হাতে হাতকড়া পবাতে পরাতে বললে, 'এইবার চলুন আমাদের সঙ্গে।'

শিবনাথ মুখ তুলে চাইলো ভারতীর দিকে। ভারতী মাথা হেঁট করলো। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করছিল, শিবনাথের আজকের এই দুর্দ্দশা ও অপমানের জন্য দায়ী শুধু সে, আর কেউ নয়। সে যদি শিবতলায় গিয়ে বটুকের ছেলের হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা না করতো, তা হলে এ দুর্য্যোগ বোধ হয় ঘটতো না।

শিবনাথ একবার বাড়ীর ভিতর দিকে চাইলে। বিছানার ওপর

বন্দী

কমলার মৃতদেহ এখনও তেমনি অপলক দৃষ্টি নিয়ে পড়ে আছে নিশ্চয়, মেয়েটাও বোধ হয় কাঁদছে তেমনি করে। শিবনাথ আর চুপ করে থাকতে পারলো না, ডাকলো, 'অতুল! একবার বাইরে আয়।'

অতুল বাইরে আসতে শিবনাথ পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললো, 'সত্যিই চললাম অতুল। ও দুটোর যা হয় একটা ব্যবস্থা করিস।'

অতুলের ঠোঁট দুটো কিছু বলবার জন্যে বার কয়েক কেঁপে উঠলো, কিন্তু কিছুই সে বলতে পারলো না। শিবনাথকে নিয়ে ইনস্‌পেক্টার আর কনষ্টেবল সুরু করলো চলতে। ভারতী যেতে লাগলো তাদের পিছনে পিছনে। অতুলও খানিকটা গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। তার পরেই মনে পড়লো, কমলার সৎকার করতে হবে, ছোট মেয়েটা সকাল থেকে এক ফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত পায় নি। অতুল তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ফিরলে।

পনের বছর পরে আবার এই গল্পের যবনিকা উঠলো।

অবিনাশবাবুর মৃত্যু হয়েছে। বিচারে শিবনাথের জেল হয়েছিল পনের বছর। ভারতীর একান্ত নীরব ও দুঃসহ প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেছে সেই পনেরটা বছব। কতদিকে কত কথা রটেছে, কেউ প্রকাশ্যে আবার কেউ আড়ালে, কতজনে করেছে কত রকমের ইঙ্গিত, ভারতী সে সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি। নিজের মন-জোড়া শূন্যতা কাউকে জানতে না দিয়ে হাসিমুখে সে বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে এসেছে জমিদারী থেকে সংসারের খুটিনাটী কাজ পর্য্যন্ত সব একাই। অবশ্য একাজে সাহায্য করেছেন তাকে অবিনাশবাবুর বন্ধু নিবারণবাবু। নিবারণবাবু শুধু অবিনাশ-বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন, একজন পাকা এটর্ণী। মৃত্যুর সময় অবিনাশবাবু নিবারণবাবুকেই ভারতীর একমাত্র অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। এই পনের বছর তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপেই পালন করেছেন, উইলের ব্যবস্থা মত ভারতীকে বিবাহ করবার জন্য কোন দিন পীড়াপীড়িও করেন নি। কারণ অবিনাশবাবু তাঁর উইলে স্পষ্ট করে লিখে গিয়েছিলেন, ভারতী স্বেচ্ছায় কাউকে বিয়ে করতে রাজী না হলে এ বিষয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করা চলবে না। অবিনাশবাবু মেয়েকে চিনতেন, সে যে শিবনাথ ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে রাজী হবে না এটুকু তিনি অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন।

দিন তিনেক আগে শিবনাথের কারামুক্তির কথা ছিল। তাই ভারতী হারাধনকে পাঠিয়েছিল কলকাতায় শিবনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্যে। আর এটর্ণী নিবারণবাবুকেও ডেকে নিয়ে এসেছিল গ্রামের বাড়ীতে।

কিন্তু তিনদিন পরেও যখন শিবনাথ এল না এবং হারাধনও ফিরলো না, তখন ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

নিবারণবাবু বললেন, 'এখনও যখন এলো না—আমার মনে হচ্ছে আর আসবে না। আর আমারও এখানে বসে থাকা চলে না,—'

ভারতী একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আজই যাবেন আপনি ?'

—'হ্যাঁ, মা, তোমার বাবার উইল তুমিই ওর হাতে দিও ; তা হলেই হবে।'

ভারতী একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'না কাকাবাবু, আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন, উইলও আপনিই করেছেন, আর তা ছাড়া বাবার মৃত্যুর সময় বাবা তো আপনাকেই অনুরোধ করে গেছেন,—আপনার মুখ থেকেই তাঁর শোনা উচিত।'

—'সবই ত জানি মা। কিন্তু যাকে বলবো তারই যে দেখা নেই।' নিবারণবাবু ম্লান হাসলেন। ভারতী বললে, 'আসবে কাকাবাবু, না এলে হারাধন ফিরে আসতো।'

নিবারণবাবু বললেন, 'কিন্তু পনর বছর জেল সে কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন মা ? পনের বছর জেলে থাকলে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়—হয়ত সেই মানুষই আর নেই—হয়ত আসবে না, হয়ত এখানে আর আসতেই চায় না—'

ভারতী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নিবারণবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো ছিল রাস্তার দিকে। ঠিক এই সময় একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। ভিতরে হারাধন আর শিবনাথ। মুহূর্ত্তের মধ্যে আলো হয়ে উঠলো ভারতীর মুখ। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যেতে যেতে বললে, 'ওই এসেছে। আপনি বসুন কাকাবাবু, আমি আসছি।'

ভারতী যখন নীচে নেমে এলো শিবনাথ তখন হলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতী এতদিন ধরে মনে মনে কত রকমের কত প্রশ্নই ঠিক করে রেখেছিল শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করবে বলে, কিন্তু দেখা যখন সত্যিই হোলো তখন কিছুই সে বলতে পারলো না, শুধু নির্নিমেষে চেয়ে রইলো শিবনাথের মুখের দিকে। শিবনাথ ক্ষীণ একটু হেসে বললে, 'কি দেখছো ? কিছু বদলাইনি। আমি ঠিক তেমনি আছি।'

এবার ভারতী কথা বলতে পারলো, জিজ্ঞাসা করলে, 'এত দেরী হলো ?'

শিবনাথ বললে, 'বেরিয়েছি ঠিক পরশুই, কিন্তু অতুলের খোঁজ করতে গিয়ে পেলাম না।'

ভারতী বললে, 'আপনার চিঠি পেয়ে আমিও তাঁকে খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। তারপর বাবা অসুখে পড়লেন, তাঁকে নিয়ে এখানে চলে এলাম।'

—'তাঁর কি হয়েছিল ? হঠাৎ—'

—'নাঃ হঠাৎ নয়'। যেদিন আপনার জেলের খবর পেলেন, সেই দিন থেকে সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না।'

—'কোথায় মারা গেলেন ? কলকাতায় ?'

—'না। এই বাড়ীতে। ওপরে চলুন, কাকাবাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছেন।'

বিস্মিত শিবনাথ প্রশ্ন করলো, 'কাকাবাবু ?'

ভারতী বললে, 'হ্যাঁ। বাবার বন্ধু এটর্নী।'

দুজনে তারা উপরে উঠে এল। ভারতী নিবারণবাবুর সঙ্গে শিবনাথের পরিচয় করিয়ে দিল।

নিবারণবাবু বললেন, 'এসো বাবা এসো, তোমার নাম শুনেছি। কিন্তু

চোখে কোনদিন দেখিনি। বোসো। তোমার জন্যে ভারতী আমাকে তিন দিন এখানে আটকে রেখেছে।'

শিবনাথ আর একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'কেন ?'

নিবারণবাবু বললেন, 'আর বল কেন বাবা। অবিনাশ মরবার আগে আমাকে এখানে আনিয়ে উইল করে গেল। আমার হাত ধরে যে কথা সে বলে গেল সেই কথাই তোমায় বলবার জন্যে এখানে বসে রয়েছি।'

ব্যাগ থেকে উইলখানা বার করে নিবারণবাবু বললেন, 'বার বার শুধু সে এই কথাই বলেছে—আমারই জন্যে শিবনাথ পনের বছর জেল খাটবে, দেখো তার ওপর আমার তরফ থেকে যেন কোন অবিচার না হয়। সবটা পড়বার দরকার নেই, এইটুকু শুনলেই তুমি সব বুঝতে পারবে।'

নিবারণবাবু উইলখানা খুলে একটা জায়গা পড়লেন :

'আমার অবর্ত্তমানে শিবনাথ জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সে পাইবে।'

উইলের কাগজগুলো শিবনাথের হাতে দিয়ে নিবারণবাবু বললেন, 'এবার তুমি নিজে সবটুকু পড়ে নিও। হ্যাঁ, আর একটা কথা—মরবার সময় অবিনাশ অনেকবার বলেছিল, শিবনাথ কাছে থাকলে তারই সঙ্গে ভারতীর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। তোমার যদি কোন অসুবিধে না থাকে, তা হলে বাবা তার এই কথাটা রেখো।'

শিবনাথ উইলের মর্ম্ম শুনেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, নিবারণবাবুর শেষ কথাটায় আরও বিব্রত হয়ে উঠলো। হাঁ কিম্বা না কিছুই সে বলতে পারলো না।

ভারতী এক পাশে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়েছিল, নিবারণবাবু তার কাছে

গিয়ে বললেন, 'আমি এখুনি চললাম মা। শিবনাথ, তুমি শিগগিরই একদিন কলকাতায় আমার অফিসে একবার দেখা কোরো—'

নিবারণবাবু নীচে নেমে গেলেন, ভারতী তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল। শিবনাথ উইলখানা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। অবিনাশ-বাবুর অর্দ্ধেক জমিদারী তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু আজকের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের দিনে তারা কোথায় যারা অতিবড় দুঃখের মধ্যে সেবা আর স্নেহ দিয়ে তার বুক ভরিয়ে রেখেছিল? কমলার কথা ভেবে লাভ নেই, সে আজ সুখ-দুঃখের হিসাব নিকাশের বাইরে, কিন্তু অতুল আর তার মেয়েটি, তারা আজ কোথায়? তাদের না পেলে এত বড় সৌভাগ্যকে সে হাসিমুখে বরণ করে নেবে কি করে? শিবনাথ অন্যমনস্ক হয়ে এইসব ভাবছিল, ভারতী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা জানতেও পারে নি; হারাধন এসে ডাকলে, 'দিদিমণি—'

ওরা দুজনেই চমকে ওঠে তাকাল হারাধনের দিকে। হারাধন জিজ্ঞাসা করলে, 'খাবার আনবো?'

'হ্যাঁ, আনো।'

হারাধন চলে যেতে ভারতী শিবনাথের কাছে এসে দাঁড়াল। পনের বছর পরে আবার এই পরস্পরকে কাছে পাওয়া, কতকথা তোলপাড় করছিল ভারতীর মনের মধ্যে। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষ শিবনাথ, ভারতীর এই দীর্ঘ প্রতিক্ষার দিনগুলি কেমন করে কাটলো সেকথা কিছুই সে জিজ্ঞাসা করলে না। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তোমাদের কোন কর্মচারী আছে, খবরের কাগজে আমি একটা বিজ্ঞাপন পাঠাব।'

—'হরিপদবাবু নীচে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।'

ভারতী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

হরিপদবাবু উপরে এলে শিবনাথ বললে, 'খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে, লিখুন।'

'বলুন কি লিখতে হবে।'

'লিখুন—অতুল, আমি এসেছি। তুমি যেখানেই থাকো—'

শিবনাথ কথাটা শেষ করতে পারলো না। খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে শূন্য আকাশটার দিকে চেয়ে সে যেন ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেল।

হরিপদ একটু অপেক্ষা করে বললে, 'তারপর বলুন—'

শিবনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ও হ্যাঁ, লিখে দিন—এখানকার ঠিকানাটা আর আমার নাম শিবনাথ মুখোপাধ্যায়—আর লিখে দিন—মেয়েটা যদি বেঁচে থাকে—'

কথাটা শিবনাথ শেষ করলে না, বললে, 'না থাক্ শুধু লিখে দিন—তুমি চলে এসো।'

খবরের কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন বা'র হ'তে লাগলো, কিন্তু অতুলের খোঁজ খবর কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবেই বা কোথা থেকে? শিবনাথের জেলের খবরটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অতুল কোন রকমে কলকাতাতেই ছিল, কিন্তু যে দিন দাদার পনের বছর জেল হওয়ার খবর তার কাণে পৌঁছল সেই দিনই সে ছোট্ট ভাইঝিটাকে বুকে করে বেরিয়ে পড়লো রাণীগঞ্জ অঞ্চলের একটা কয়লাকুঠীর উদ্দেশ্যে। পণ্ডিতের ভাই কাজ করতো এই কয়লাকুঠিতে, পণ্ডিত নিজেও মাসকয়েক আগে সেখানে গিয়ে একটা

৮

পাঠশালা খুলেছিল। অতুল এসে উঠলো তাদেরই আশ্রয়ে। তারপর সেইখানেই—

সকালবেলায় পাঠশালার ছেলেদের ঘণ্টা দুই পড়ানো,দুপুরে রান্না-বান্না, তারপর বিকেল থেকে সুরু করে সেই রাত দশটা পর্য্যন্ত তাস আর দাবা, প্রথম কয়েকটা বছর অতুলের বেশ ভালই কেটেছিল। কিন্তু ইদানিং ভাইজি কল্যাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রীতিমত ভাবতে হচ্ছে অতুলকে। কল্যাণীর বয়স হোলো প্রায় যোল বছর। এখন রান্না-বান্নার ঝঞ্ঝাট কল্যাণী নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে, কিন্তু চিরটাকাল খুড়োর ভাত রাঁধলে চলবে না, বিয়ে দিতে হবে তার অথচ এমন কোন সঙ্গতিই অতুলের নেই যাতে মনোমত একটা পাত্রের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দেবার সাহস সে করতে পারে। আবার সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে নইলে কল্যাণীকে অতুল যার-তার হাতে তুলে দিতে পারবে না, কিছুতেই না। গরীবের ঘরে এসে কল্যাণীর মাকে কি দুঃখ কষ্ট পেতে হয়েছে সেকথা অতুল ভোলে নি। কাজেই এমন ঘরে কল্যাণীর বিয়ে দিতে হবে যেখানে অনাহারে অচিকিৎসায় মরতে হবে না।

ভাল একটা পাত্র অবশ্য অতুল মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। ছেলেটীর নাম পরেশ। এই অঞ্চলে ডাক্তারখানা খুলেছে সম্প্রতি, পাশকরা ডাক্তার, রোজগারপত্র বেশ ভালই। আবার বাড়ীর অবস্থাও ভাল—খবর পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় পরেশ সাইকেল করে প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসে। কল্যাণীর সঙ্গে তার ভাবও হয়েছে একটু আধটু, সেখবরও অতুল রাখে। আভাবে ইঙ্গিতে কথাটা অতুল পরেশকে জানিয়েছেও কয়েকবার, বাপের ভয়ে পরেশ এখনও পুরোপুরি সম্মতি দিতে পারে নি।

বন্দী

কয়লাকুঠি, সহর আর ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তা হলেও নিয়মিত খবরের কাগজ পৌঁছয় সেখানে, প্রতিদিন সকালে সাইকেল চ'ড়ে খবরের কাগজের এজেণ্টরা কাগজ বিলি করে যায়। পণ্ডিতের পাঠশালেও কাগজ আসে দৈনিক, সেকাগজগুলোয় শিবনাথের বিজ্ঞাপনও থাকে প্রায়ই, কিন্তু সেটা না পড়ে অতুলের চোখে, না পড়ে পণ্ডিতের। অতুল এই কয়লা-কুঠির দেশে এসেই পণ্ডিতের চেষ্টায় একটু লেখাপড়া শিখেছে বটে, কিন্তু খবরের কাগজ পড়বার মত উৎসাহ তার আজও হয় নি।

সেদিন সকালে অতুল খবরের কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। শিবনাথের বিজ্ঞাপনটা তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, তবু অতুলের চোখে পড়লো না।

কল্যাণী এসে ডাকলে, 'কাকাবাবু, খাবে এসো।'

অতুল কাগজখানা রেখে উঠে পড়লো। ভিতরে এসে দেখলো পরেশ তাকে দেখে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

অতুল হাঁক পাড়লো—'বলি ও ডাক্তার, পালাচ্ছ কেন? শোনো!'

পরেশ কুণ্ঠিত ভাবে অতুলের সামনে এসে দাঁড়াল।

অতুল জিজ্ঞাসা করলে, 'চিঠি লিখেছিলে তোমার বাবাকে?'

—'আজ্ঞে না, বড় ভয় করছে।'

অতুল রেগে উঠলো, বললে, 'ভয় করছে? কেন হে, আমার বাড়ীতে আসতে তো ভয় করে না? কল্যাণীর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতে তো ভয় করে না?'

কল্যাণী আরক্ত মুখে বলে উঠলো, 'কি যে বল কাকাবাবু পাগলের মত! চল খাবে চল—'

অতুল বললে, 'হুঁ, পাগলের মত! তা বলবি বৈকি, তোর বাবা বলেছে, তোর মা বলেছে, আবার তুইও বল্। ওসব শুন্‌বো না, ওসব শুন্‌বো না, ভালবাসবি একজনকে তারপর বিয়ে দেব আর একজনের সঙ্গে তারপর ধড়ফড় করে আধবেলাতে মরে যাবি। তা আমি হতে দিচ্ছি না বাবা। বলি ওহে ডাক্তার, চিঠি তুমি লিখবে কি না বলো—'

পরেশ একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তার চেয়ে আপনি নিজে একবার যান না আমার বাবার কাছে। আপনারই যাওয়া উচিত!'

'—হ্যাঁ, তা আমি যেতে পারি। আমাকে কম লোক পাওনি, আমি লাটসায়েবের কাছে যেতে ভয় পাই না। বল, নাম ঠিকানা বল, আমি গিয়ে একেবারে পাকাপাকি দিন ঠিক করে আসছি।'

—'লিখে নিন, নইলে আপনার মনে থাকবে না।'

—'কাগজ কলম তো আমার কাছে নেই, চলো পণ্ডিতের কাছে চলো। কাগজ কলম, পাঞ্জিকা, সব আছে তার কাছে।'

পরেশকে নিয়ে অতুল পণ্ডিতের ঘরে হাজির হোলো।

—'পণ্ডিত, দিন ঠিক করে ফ্যালো হে। কল্যাণীর মায়ের বিয়ে দিয়েছিলে, এবার কল্যাণীর বিয়ে দাও।'

পণ্ডিত দিবানিদ্রার উপক্রম করছিল, চমকে উঠে বললে, 'বিয়ে! ঠিক হয়ে গেল?'

—'হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে গেল। তুমি উঠে বসো দেখি, কাগজ কলম নিয়ে লিখে ফেলো বরের বাপের নাম-ঠিকানাটা—ওঠো শিগ্‌গির—'

পণ্ডিত হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে কাগজ কলম বা'র করলো।

অতুল বললে, নাও ডাক্তার, বলো।'

বন্দী

—'লিখুন, পুরন্দরপুর গ্রাম, রেলষ্টেশন তপসী, ষ্টেশনে নেমে খুব কাছে—গ্রামে ঢুকে জিজ্ঞাসা করবেন—বটুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী—সবাই বলে দেবে।'

—'তোমার বাবার নামটি কি বললে ?'

—'বটুক বন্দ্যোপাধ্যায় !'

—'তপসী ষ্টেশনে নেমে পুরন্দরপুর গ্রামের বটুক বাঁড়ুয্যে, কেমন এই তো ? ঠিক আছে। ছাখো না কালই আমি সেখানে গিয়ে সব পাকাপাকি করে আসছি।'

অতুল অনেকদিন পরে তালি দেওয়া পুরানো কোটটা ট্রাঙ্ক থেকে বার করে গায়ে চড়িয়ে পরদিন সত্যিসত্যিই পুরন্দরপুর চলে গেল। জুতো পরার অভ্যাস তার কোন দিনই ছিল না, সঙ্গে রইলো শুধু এক সময়ে চৌদ্দ আনা দাম দিয়ে কেনা ছেঁড়া ছাতাটা।

পুরন্দরপুরে বটুক বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে শিবনাথ মুখুয্যেকে দেখা গেল। ঠিক অপ্রত্যাশিত ভাবে নয়, একটা বাগান নিয়ে দুতরফে গোলমাল চলছিল কিছু দিন থেকে। তারই একটা মীমাংসার জন্ম শিবনাথকে নিজে আসতে হয়েছিল বটুকের বাড়ীতে।

খালি পায়ে এক হাঁটু ধুলো আর বগলে ছেঁড়া ছাতা নিয়ে অতুল যখন বটুকের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকবে কি না ভাবছিল, ঠিক সেই সময় ভিতরের ঘরে শিবনাথের সঙ্গে বটুকের কথা হচ্ছিল :

—'এই আপনার শেষ কথা ?'

—'আমার নাম বটুক বাঁড়ুয্যে, আমার কথার নড় চড় হয় না।'

—'তা হলে তাই ঠিক রইলো। আপনার ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে আপনি টাকা মিটিয়ে দেবেন। তিন মাস সময় দিলাম। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিয়ে আজকালকার দিনে—আড়াই হাজার টাকা—পারবেন দিতে ?'

—'নিশ্চিন্ত থাকুন! ছেলে আমার ডাক্তারী পাশ করেছে। তা ছাড়া বলরামপুরের জমিদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমার পাকাপাকি হয়েই আছে। টাকা আপনি পাবেন।'

—'টাকা না পেলে বাগান আমি জোর করে দখল করবো। মনে থাকে যেন।'

শিবনাথ উঠে পড়লো। বাইরে জুড়ি দাঁড়িয়েছিল। শিবনাথ এসে গাড়ীতে উঠে বসলো। অতুল তখন একজন চাকরের কাছে বটুক বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে আছেন কিনা তারই খোঁজ নিচ্ছিল, কেউ কাউকে দেখলো না। দেখলেও একজন আর একজনকে চিনতো কিনা সন্দেহ!

চাকরটা তো অতুলের জামা কাপড়ের অবস্থা দেখে কিছুতেই তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না; অতুল এক রকম জোর করেই ভিতরে ঢুকে কাছারী ঘরে এসে দাঁড়াল।

বটুক তখন নায়েবের সঙ্গে বাগানের ব্যাপারে গভীর পরামর্শে লিপ্ত।

অতুল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনিই বটুক বাবু ?'

বটুক বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে চিনতে পারলাম না তো ?'

—'চিনবেন, চিনবেন, আগে সম্বন্ধটা পাকাপাকি হোক, কাজ-কর্ম্ম চুকে যাক, তখন চিনবেন।'

বটুকের মাথার মধ্যে তখন বাগানের দরুণ টাকার চিন্তাটাই গিজ-গিজ করছে, অতুলের কথার কিছুই যে ঠিক বুঝতে পারলে না, জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বলছেন আপনি ?'

—'আমি বলছি আপনার ছেলে পরেশ ডাক্তারের বিয়ের কথা। আমার বোনঝী সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

—'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। শুনুন নায়েব মশাই, বাগানের দখল আমি ছাড়বো না।'

—'কেন ছাড়বেন ? যা ছাড়বার তাত ছেড়েই দিয়েছেন। নায়েব সায়দিলে।'

অতুলের এসব কথায় জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য্য ছিল না, সে হাত পা নেড়ে বলে উঠলো, 'তুমি চুপ করো তো দাদা, আগে আমার কথাটা হয়ে যাক। বিয়ে আপনাকে দিতেই হবে, শুনছেন ?'

নায়েব অতুলের উপর চটে উঠেছিল, সে বললে, 'গায়ের জোরে নাকি ?' অতুল ঘাবড়াল না, বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গায়ের জোরে।'

নায়েব বললে, 'আড়াই হাজার টাকা দিতে পারবেন ?'

বটুক বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো, 'আঃ, কাকে কি জিজ্ঞাসা করছেন বলুন তো ? চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারেন না ?'

—'চেহারা দেখে আপনি চিনে ফেললেন ?' অতুল বলে উঠলো—'হুঁ, যার মেয়ে তার কাছে আড়াই হাজার টাকা কিছুই নয় তা জানেন ? আর আপনার কাছে নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারি তা আড়াই হাজার ! আপনি যাবেন কি না তাই বলুন।'

বন্দী

বটুক দেখলে লোকটাকে ভাল কথায় তাড়াতে না পারলে যাবে না, বললে, 'আচ্ছা যাব।'

—'নিশ্চয় যাবেন বলুন, পরশু ভাল দিন আছে।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব।'

অতুল খুসী হয়ে বললে, 'বাস্, আপনি যাবেন বললেই হলো। আর আমি কিছুই চাই না। আমি চলি তা হলে—'

বটুক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নায়েবের সঙ্গে বাগানের ব্যাপারটা সেরে ফেলবার জন্য আবার তৈরী হচ্ছিল, অতুল দু'পা এগিয়ে গিয়েই ফিরে এসে বললে, 'আবার বলুন, আপনি যাবেন পরশু।'

—'হ্যাঁ, যাব। যাব। যাব।'

—'ব্যস, আর বলতে হবে না আপনাকে—'

অতুল নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নায়েব খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'লোকটা সত্যি বিশ্বাস করে গেল যে!'

বটুক হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'আপনিও যেমন।—ওটা পাগল। চেহারা দেখে চিনতে পারলেন না? বদ্ধ পাগল!'

পুরন্দরপুর থেকে ফিরে গিয়ে অতুল পরেশ ডাক্তারকে জানিয়ে দিলে, তোমার বাবার কথা আদায় করে এনেছি ডাক্তার, আর কোন ভয় নেই। পরশু বিয়ে।

পরেশ কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা নিজে আসবেন তো?'

অতুল হো-হো করে একচোট হেসে নিয়ে বললে, 'কি বলে দ্যাখো!

তাঁর ছেলের বিয়ে, আর তিনিই আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন, নিশ্চয় আসবেন। তোমায় কিচ্ছুটী ভাবতে হবে না ডাক্তার, কিচ্ছুটী ভাবতে হবে না। আমি আছি, পণ্ডিত আছে, পণ্ডিতের ভাই আছে। আমরাই তোমার হয়ে কেনা কাটা সব করে ফেলবো। কল্যাণীর বাবার বিয়ে দিয়েছিলাম এর চেয়ে তাড়া হুড়ো করে, একেবারে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, বুঝলে ডাক্তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—'

বলতে বলতে অতুলের গলার স্বরটা হঠাৎ যেন ধরে এল, মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে অতুল বললে, 'যেতে দাও এ সব পুরণো কথা। পরশু তোমার বিয়ে। এই কথা পাকা।'

বিয়ের দিন বেলা পাঁচটা বেজে গেল, কিন্তু না দেখা গেল বটুক বাঁড়ুয্যেকে, না এলো পুরন্দরপুর থেকে লোকজন। পরেশ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার খানিক পরেই বিয়ের লগ্ন। অতুল আর পণ্ডিত মিলে সব রকম আয়োজনই করে রেখেছে। তাদেরই ব্যবস্থা মত পরেশকে সকাল থেকে আসতে হয়েছে পণ্ডিতের বাসায়। কিন্তু বাবার অনুপস্থিতে বিয়ে করবার মত সাহস পরেশ যেন মনের মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যার মুখে অতুলের সঙ্গে দেখা হতেই পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কই, বাবা তো এখনও এলেন না?'

অতুল তখনও বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দিলে, 'আমাকে কথা দিয়েছেন যখন নিশ্চয়ই আসবেন।'

পরেশ বললে, 'আবার আসবেন কখন? আপনাকে ঠিক উনি পাগল ভেবেছেন।'

—'পাগল? আমাকে? পণ্ডিত! শোনো, পরেশ ডাক্তারের কথা শোনো—'

বলতে বলতে অতুল ঢুকলো গিয়ে পণ্ডিতের ঘরে।

পণ্ডিত বললে, 'বাবারে বাবা, এত ডাকাডাকি কেন? এ তো ডাক্তারের বিয়ে নয়, যেন আমার বাবার বিয়ে!'

—'শোনো, শোনো, পরেশ বলছে, ওর বাবা আমাকে পাগল ভেবেছে। বলছে বাবা না এলে বিয়ে করবে না।'

—'বিয়ে করবে না! পণ্ডিত চটে উঠে বললে—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হয়ে গেল এখন বিয়ে করবে না! লগ্নটা বয়ে যাবে, বাস্, তারপর মর তুমি ঐ মেয়ে নিয়ে! কোথায় সে? ইচ্ছেটা আছে ষোল আনা আবার বলে কিনা বিয়ে করবে না। কোথায় সে? তুমি ভেবোনা অতুল, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—'

বাইরের দিকের পাঠশালার ঘরটা সকাল থেকে পাত্র পক্ষের বাড়ী হিসেবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। অতুলকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিত হাজির হলো সেখানে। অতুলকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হে ডাক্তার, শুনছি নাকি তুমি বিয়ে করবে না বলেছ!'

—'আজ্ঞে না, সেকথা বলিনি। কিন্তু বাবা এলেন না কেন তাই ভাবছি—'

—'বাবা না এলে বিয়ে করবে না?'

—'করা কি উচিত, আপনি বলুন?'

—'না, লগ্নটা ভ্রষ্ট করে দিয়ে এই মেয়েটার সর্ব্বনাশ করে দেওয়া উচিত! বলি বিয়ে তুমি করবে, না তোমার বাবা করবে?'

পরেশ কোন জবাব দেবার আগেই মেয়ের দল ঘরে ঢুকে পড়লো।

একজন বললে, 'কাউকে যেতে হবে না পণ্ডিত মশাই, আমরা এসে পড়েছি। ভালয় ভালয় না আসে তো কাণ ধ'রে আমরা বরকে নিয়ে যাব।'

পরেশ ডাক্তার বিব্রত হয়ে বললে, 'থাক, থাক, কাণ ধরতে হবে না। কি করতে হবে বলুন—'

মেয়ের দল সমস্বরে বলে উঠলো, 'চলো আমাদের সঙ্গে—'

তারা হাত ধরে টানতে টানতে পরেশকে ভেতর বাড়ীতে নিয়ে গেল। পণ্ডিত অতুলকে বললে, 'হলো ত ?'

অতুল চিন্তিত ভাবে বললে, 'তা হ'লো কিন্তু এত করে বললে যাব তবু ওর বাবা এলো না কেন বলো ত ?'

পণ্ডিত বললে, 'না এলো, না এলো, তোমার কি হে ! আসল কাজটা চুকিয়ে ফেলি চলো—'

'সেই ভালো' চলো।'

অতুল পণ্ডিতের সঙ্গে ভিতরের দিকে চললো।

রাত নটা বাজবার আগেই বিয়ে চুকে গেল। বাসর ঘরের মেয়েদের হাসি কলরবের মধ্যে পরেশ ডাক্তার ভুলেই গেল যে এ বিয়েতে তার বাবা আসেন নি, তাঁর সম্মতি না নিয়েই সে এত বড় একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছে !

বিয়ের পর পরেশ কল্যাণীকে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। ছোটো বাংলো, একটা চাকর, রাঁধুনী বামুন একজন এবং নিজে আর কল্যাণী। চার জনের এই ছোট্ট সংসারটাকে কল্যাণী নিজেই কয়েকদিনের মধ্যে একেবারে পরিপাটী করে সাজিয়ে গুজিয়ে ফেল্লে। বাসাড়ের বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় দেখতে দেখতে এলো ছন্দ আর মাধুর্য্যের জোয়ার। তবু পরেশ যেন এই সুখের সবটুকু প্রাণভরে উপভোগ করতে পারে না, বটুক বাঁড়ুয্যে কবে হঠাৎ এসে পড়েন আর এসেই যদি বুঝতে পারেন, পরেশ তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। কি অবস্থায় তাকে বিয়ে করতে হয়েছে সে কথা তিনি জানতে চাইবেন না, তখন অসহ্য ক্রোধে তাঁর মুখের ভাবটা কি রকম হবে সেকথা ভাবতে গেলেই পরেশ বিব্রত, বিচলিত হয়ে পড়ে।

সেদিন পরেশ 'কল্' থেকে ফিরেই শুনলো কল্যাণী ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে গুন্ গুন্ করে গান গাইচে। পরেশের পায়ের শব্দ শুনেই কল্যাণী গান বন্ধ করলো।

পরেশ বললে, 'থামলে কেন? ভাল করে গাও না।'

কল্যাণী হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ, গাইবার সময়টা বেশ। তুমি বাপের ভয়ে অস্থির হয়ে বসে থাক, আর আমি মনের আনন্দে গান গাই।'

পরেশ নাছোড়বান্দা, বললে, 'তা হোক, তুমি গাও না লক্ষীটি—'

কল্যাণী বললে, 'যাও! লজ্জা করে না বুঝি আমার?'

—'কে আছে এখানে? লজ্জা করবে কাকে?'

—'বারে বা! ওই যে ঠাকুর, তারপর চাকর—'

—'ও ঠাকুর চাকর! ওরা আবার—'

—'আচ্ছা, শোনাচ্ছি। কিন্তু শোনবার আগে তোমাকে একটা কথা শুনিয়ে রাখি। বাবা এলে তোমার যদি খুব বেশী ভয় করে, আমায় ঠেলে দিও। আমি দেখে নেবো, বুঝলে ?'

কল্যাণীর কথায় সায় দিয়ে পরেশ কতকটা আশ্বস্তভাবে গান শুনতে বসলো।

ওরা কয়েকদিন ধরেই ভাবছিল বটুক বাঁড়ুয্যে এইবার নিশ্চয় এসে পড়বেন, তারপর সেদিন তিনি সত্যি সত্যিই এসে পড়লেন। শুধু এসে পড়লেন নয়, পরেশের সঙ্গে যে জমিদারের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে রেখেছিলেন তাকে শুদ্ধ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ছেলে দেখিয়ে কথাটা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলতে। বটুক বাড়ুয্যের গাড়ি এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই পরেশ লুকোবার চেষ্টা করলো, অতুল এসেছিল কল্যাণীর খোঁজ খবর নিতে, সে পর্য্যন্ত একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। বটুক বাঁড়ুয্যে ভাবী বেয়াইকে বাইরের ঘরে বসালেন। এতটা পথ গাড়িতে আসতে তিনি রীতিমত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠেছিলেন, এক গ্লাস জল চাইলেন তিনি। চাকর এবং ঠাকুর দুজনেই তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত, কল্যাণী নিজেই মাথায় ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে এলো। জলের গ্লাস তাঁর সামনে নামিয়ে রেখে নীচু হয়ে প্রণাম করলো শ্বশুরকে।

বটুক বাঁড়ুয্যে রীতিমত অবাক হয়ে পড়েছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কই, চিনতে পারলুম না তো মা—

জবাব দিলে অতুল; বললে, 'বা বাঁড়ুয্যে মশাই, বেশ ?—সেই যে আপনাকে গিয়ে বলে এলাম, আমার ভাইঝির সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে হবে। তা আপনিও কথা দিলেন আর আমিও এসে সমস্ত

যোগাড়যন্ত্র করে ফেললাম। কিন্তু আপনার আক্কেলখানা কি বলুন তো? কথা দিয়ে এলেন না। কিন্তু এলেন না বলে বিয়ে তো আর বন্ধ থাকতে পারে না, বিয়ে আমি সেই দিনই—'

বটুক বাঁড়ুয্যের মুখ অসহ্য ক্রোধে একেবারে কালো হয়ে উঠলো। তিনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'সে হতভাগা কই? কোথায় গেল সে?'

অতুল বললে, আছে, 'আছে বাবাজী বাড়ীতেই আছে। শুধু আপনার ভয়ে—'

—'আমার ভয়ে! আমার সর্ব্বনাশটা করে এখন ভয়। ডাক, ডাক দেখি হতভাগাকে—'

পরেশ এসে মাথা হেঁট করে বটুকের সামনে দাঁড়াল।

বটুক বললেন, 'এই লোকটা যা বলছে তাই কি আমায় সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?'

পরেশ ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ।'

বটুক আবার চীৎকার করে উঠলেন, 'এর চেয়ে আমার মাথায় দশ ঘা জুতো মারলি না কেন তুই, জুতো মারলি না কেন আমার মাথায়? আমি যে একজনকে কথা দিয়ে রেখেছি, পাওনা গণ্ডার কথা পর্য্যন্ত। সব ঠিক, এখন কি করে আমি তাকে মুখ দেখাব, কি করে দাঁড়াব গিয়ে তার সামনে?'

কিন্তু ভাবী বেয়াইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার অথবা তাঁকে মুখ দেখাবার দরকার বটুকের আর হোলো না। ভেতরে যে গোলযোগ চলছিল বাইরের ঘরে বসে তার কিছু কিছু আভাষ পেয়েই তিনি নিঃশব্দে বিদায়

নিয়েছিলেন। ভাড়াটে গাড়িটা তখনও দরজার, কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে দিক থেকে কোন অসুবিধা হয় নি।

ভদ্রলোক চলে গেছেন শুনে বটুক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটামুটি কিছু টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনাটা যে চিরকালের মত ঘুচে গেল, সেকথাটা মনে হতেই তিনি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

পরেশকে বললেন, 'আমি আজই বাড়ী ফিরবো, তুইও চল্ আমার সঙ্গে।'

অতুল বললে, 'বাঃ বেয়াই মশাই, আপনার বুদ্ধি তো খুব! আপনি বাবাজীকে নিয়ে বাড়ী যাবেন, মেয়েটা থাকবে কোথায়?'

বটুক বললেন, 'জানিনা। যার তার মেয়েকে আমি—'

অতুল বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'ওরকম কথা বলবেন না বেয়াই মশাই, আমি বরদাস্ত করতে পারবো না। আমার আপন দাদার মেয়ে, আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওর বাপকে যদি একবার দেখতেন তা হলে বুঝতেন—'

বটুক বললেন, 'পাগলের পাগলামী শোনবার সময় নেই, তুমি তৈরী হয়ে নাও পরেশ?'

অতুল বললে, 'বা বা বা বা! তৈরী হয়ে নাও পরেশ! মেয়েটা যাবে কোথায়, থাকবে কার কাছে? না, না, ও সব হবে না বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার ছেলের বউ, ওকে আপনার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। ওতো কোন দোষ করে নি, আপনার ছেলে দেখে শুনে, দিব্যি চোখ খুলে ওকে বিয়ে করেছে—'

বটুক চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,

"আচ্ছা, তোমার ভাইঝিকে আমি নিয়ে যাব। কিন্তু একটা সর্ত্তে। তুমি নিজে কোন দিন সেখানে যেতে পাবে না ; রাজী আছ—?'

অতুল বললে, 'খুব রাজী আছি,—খুব রাজী আছি। মেয়েটা যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে আমি সব করতে রাজী আছি—'

বটুক আবার বললেন, 'আর কোনদিন যদি তোমায় আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোতে দেখি তা হলে দারোয়ানের গলা ধাক্কা খেতে হবে, মনে থাকে যেন।'

অতুল বললে, ঠিক মনে থাকবে, ঠিক মনে থাকবে, আপনি এখন ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যান।'

বিকেলবেলায় বটুক ছেলে বউ নিয়ে পুরন্দরপুর যাত্রা করলেন। কল্যাণী চোখের জল মুছতে মুছতে অতুলের কাছে বিদায় নিল।

অতুল বললে, 'কাঁদিস নি মা কাঁদিস নি, শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস, ভাল খাবি, সুখে থাকবি বলতে বলতে সে নিজের চোখের জল মোছবার জন্যে গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল। গাড়ি যখন পুরন্দরপুরের কাছাকাছি এসে পৌছল, তখন সন্ধ্যে হতে আর দেরী নেই। গ্রামে ঢোকবার মুখেই শিবনাথের সঙ্গে বটুকের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। শিবনাথ টমটমে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। বটুককে দেখেই শিবনাথ বললে, 'এই যে বটুকবাবু!'

বিব্রত বটুক গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বললেন। শিবনাথের টমটমও থামলো।

বন্দী

শিবনাথ বললে, 'কি ব্যাপার ? বৌ নিয়ে এলেন মনে হচ্ছে ? লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলের বিয়ে দিলেন। টাকাটা এইবার দিয়ে দিন তা i ল।'

বটুক বললেন, 'আর বলেন কেন মশাই ! এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল ! একটি পয়সা পেলাম না, ছেলে ওদিকে বিয়ে করে বসলো।'

শিবনাথ বললে, 'ওসব ফাঁকা কথা আর শুনবো না বটুকবাবু, আমার টাকা চাই।'

—'হ্যাঁ টাকা আপনি পাবেন। চেষ্টা করবো।'

—'আমি আর সময় দেব না। আপনার চালাকী আমি বুঝতে পেরেছি।'

—'কি করবেন ?'

—'যেমন করে পারি বাগানের গাছ কেটে দখল নেব।'

—'আপনি পারবেন না।'

—'আচ্ছা পারি কি-না তাই দেখবো।'

—'হ্যাঁ তাই দেখবেন।'

—'তা হলে এই কথাই রইলো।'

শিবনাথের টমটম আবার চলতে সুরু করলো। বটুক নিস্ফল আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগলেন সেই দিকে চেয়ে।

পরেশ বললে, 'আপনি ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করলেন কেন বাবা ?'

বটুক বললেন, 'জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ! এর জন্যে তুমিই দায়ী। বড়বাগান একদিন আমার ছিল, অত বড় একটা সম্পত্তি আজ আমাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে শুধু তোমারই জন্যে !'

পরেশ বললে, 'বিয়ে দিয়ে ছেলেকে জমিদার-বাড়ীতে বিক্রী করে সম্পত্তি আপনার নাই-বা রাখলেন।'

'আড়াই হাজার টাকা আপনাকে আমি রোজগার করে দেব।'

বটুক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ দেবে! তুমি সব দেবে! এই যে দিলে!' গাড়ি আবার চলতে সুরু করলো।

কল্যাণী শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে অতুলের কাজকর্ম্ম সব যেন ফুরিয়ে গেল। অতুল না পারে পাঠশালায় ছেলে-মেয়েদের পড়াতে, না পারে পণ্ডিত এবং আর-পাঁচজন পরিচিত লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কইতে। বিয়ে হবার আগে রান্নাবান্নার ভারটা কল্যাণী নিজেই নিয়েছিল, কল্যাণীর বিয়ের পর অতুল সে ভারটা আবার তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে। কিন্তু বটুক বাঁড়ুয্যে যেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, সেদিন থেকে রান্না-বান্নার কাজে অতুলের উৎসাহ ফুরিয়ে গেল। অতুল এখন পাঠশালা থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিরিবিলি একটা গাছতলা বেছে নিয়েছে। দিনের বেলার বেশীর ভাগ সময় তার কাটে এখন এই গাছতলায়। বসে বসে রামায়ণ মহাভারত পড়ে। অনেক সময় পড়তে ঠিক ভাল লাগে না, তবু পড়ে। রান্নার পাট সে তুলেই দিয়েছে। কোনো দিন চিঁড়ে ভিজিয়ে ফলার করে, কোন দিন মুড়ি চিবিয়েই কাটিয়ে দেয়। পণ্ডিত বিরক্ত হয়, রাগ করে, অনুযোগ করে। কিন্তু অতুলের উৎসাহ আর ফিরে আসে না। সেদিন সে শুধু ম্লান একটু হেসে বললে, 'বুড়ো বয়েসে আর অত হাঙ্গামা করতে পারিনে পণ্ডিত!'

পণ্ডিত বোঝে, তাই বেশী কথা বলবার সাহস তার হয় না।

গাছতলায় বসে বসে অতুল ভাবে কল্যাণীর কথা, দাদা শিবনাথের কথা।

দাদা নিশ্চয় এত দিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেমন আছে কে-জানে! কল্যাণীর জমিদার-বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে এ-খবর পেলে শিবনাথের মুখ খুসীতে কতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অতুল মনে মনে সেটা কল্পনা করবার চেষ্টা করে। দাদার কথা ভাবতে গিয়ে কল্যাণীর কথা আরও বেশী করে মনে পড়ে যায়। বটুক বাঁড়ুয্যে যখন কল্যাণীকে নিয়ে যেতে রাজি হ'ল, অতুল তখন হাতের মুঠোয় যেন স্বর্গ খুঁজে পেয়েছিল। এখন কিন্তু মনে হয়, কল্যাণী পরেশের সঙ্গে এখানে থাকলেই-বা এমন-কি ক্ষতি ছিল! যখন-তখন সে পরেশের বাংলোয় গিয়ে কল্যাণীকে দেখে আসতে পারতো, দু'দণ্ড কথা কয়ে আসতে পারতো তার সঙ্গে।

অতুল পণ্ডিতকে ডেকে বলে, 'শ্বশুরবাড়ী গেলেই মেয়েগুলো একেবারে পর হয়ে যায়, কি বলো পণ্ডিত?'

পণ্ডিত হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন বল তো?'

অতুল বলে, 'কেন আবার! এই কল্যাণীর কথাই ধর না কেন, আজ দু'মাস শ্বশুরবাড়ী গেছে, একখানা পত্র লিখে তোমার-আমার খোঁজটা নিলে!'

পণ্ডিত বলে, 'সবে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে গেছে, এখন তোমার আমার কথা কি তার মনে আছে!'

অতুল বলে, 'তাইতো বলছিলাম তোমায়—'

—'তা মেয়েটার জন্যে যদি মন কেমন করে, দুদিন গিয়ে ঘুরে এস না। বলি পরতো নয়, বেয়াই-বাড়ী।'

বন্দী

অতুল পণ্ডিতের কথার জবাব দেয় না। বটুক বাঁড়ুয্যের শেষ কথাটা তার মনে পড়ে। না, না, সেখানে তার যাওয়া চলবে না, কিছুতেই চলবে না।

অতুল বটুককে কথা দিয়েছে। কল্যাণী সুখে থাক্। অতুল তার কথা রাখবে। কিছুতেই সে সেখানে যাবে না।

কিন্তু কথাটা শেষ পর্য্যন্ত রাখা বোধ হয় হলো না।

দিন-কয়েক পরে, অতুল একদিন গাছতলায় বসে আছে। পিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। অতুল তো অবাক্!

—'বলি কার চিঠি হে? অপরের চিঠি আমায় দিয়ে যাচ্ছ না তো?'

—'আজ্ঞে না বাবু। চিঠি আপনারই।'

পিওন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অতুল পোষ্টকার্ডখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে দেখতে লাগলো। চিঠির শেষে কল্যাণীর নাম লেখা। অতুলের প্রথমটা বিশ্বাস হলো না। কিন্তু না, কল্যাণীর লেখাই বটে। কল্যাণী প্রথমেই কাকাবাবুকে প্রণাম জানিয়ে লিখেছে, এখানে এসে সে বেশ মনের আনন্দে আছে। সংসারের নানা কাজের জন্যে সময় মত সে চিঠি দিতে পারে নি। এ জন্যে অতুল যেন কিছু না মনে করে।

ব্যস্, চিঠির বাকিটুকু পড়বার ধৈর্য্য আর অতুলের রইলো না। পোষ্টকার্ডটা হাতে করে সে ছুটলো পণ্ডিতের সন্ধানে। পণ্ডিতকে পাঠশালাতেই পাওয়া গেল। অতুল চিঠিখানা পণ্ডিতের সামনে ধরে বলতে লাগলো, 'কল্যাণী চিঠি লিখেছে পণ্ডিত, কল্যাণী চিঠি লিখেছে। কেমন বড় ঘর দেখে বিয়ে দিলাম, তখন তোমায় বলেছিলুম না পণ্ডিত—'

বন্দী

কল্যাণীর চিঠি আসায় পণ্ডিতও বড় কম খুসী হয় নি। সে বললে, ‘পড়ো পড়ো, কি লিখেছে ভাল করে পড়ো।’

অতুল বললে, ‘ভাল আছে, সুখে আছে—শ্বশুরবাড়ী খুব ভাল লেগেছে। চিঠি দিতে পারেনি বলে আমি যেন কিছু মনে না করি, এই সব। মনে আবার কি করবো বলতো পণ্ডিত ? নতুন শ্বশুর ঘর করতে গেছে, চিঠিপত্র দিতে একটু দেরী হবেই ত। তার জন্যে মনে আবার কি করবো হে।’

বলেই সে চিঠিটা আবার ভাল করে পড়তে সুরু করলে। শেষের দিকটা পড়তে পড়তে তার মুখ-চোখ শুকিয়ে উঠলো, হাতটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

পণ্ডিত আশ্চর্য্য হয়ে বললে, ‘কি হে অমন করছ কেন ? হোলো কি ?’

অতুল শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলে, ‘কল্যাণীর অসুখ।’

পণ্ডিত বললে, ‘তবে যে বললে ভাল আছে—’

অতুল বললে, ‘তাইতো লিখেছিল গোড়ায়। শেষটায় লিখেছে আজ ক'দিন থেকে অসুখ, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কাকাবাবু—’

পণ্ডিত বললে, ‘তাই তো—’

অতুল চিঠিখানা ফতুয়ার পকেটে পুরতে পুরতে বললে, ‘তাইতো নয় পণ্ডিত। আমি চললুম।’

—‘যাওয়া দরকার বৈকি। কিন্তু সেদিন যে বললে, বাঁড়ুয্যেকে তুমি কথা দিয়েছ।’

কিন্তু বটুক বাঁড়ুয্যেকে কি কথা দিয়েছিল সে-কথা ভাববার সময় তখন অতুলের নেই। ঘরে ঢুকে ছেঁড়া উড়নীখানা কাঁধে ফেলে সে কল্যাণীর শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

পণ্ডিত বললে, 'কিছু খেয়ে যাবে না ?'

অতুল বললে, 'দিলে তো পিছু ডেকে ? না না, সময় নেই পণ্ডিত। পথে মুড়িটুড়ি কিছু কিনে খাব।'

অতুল যখন কল্যাণীর শ্বশুর-বাড়ীতে পৌঁছল তখন রাত প্রায় আটটা বাজে। বাড়ীর দরজায় দারোয়ান পর্য্যন্ত নেই, চারিদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। অতুল ভিতরে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে অন্দর-মহলে পৌঁছে আরও আশ্চয্য হয়ে গেল। এদিকেও লোকজনের কোন সাড়া-শব্দ নেই। আরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতেই সে কল্যাণীকে খুঁজে পেলে। অতুল কল্যাণীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছিস মা, কেমন আছিস ?'

কল্যাণী বললে, 'এখন একটু ভাল আছি কাকাবাবু। কদিন জ্বরে মাথা তুলতে পারি নি।'

অতুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। কিন্তু বাড়ার এই স্তব্ধ ভাবটা তার ভাল লাগছিল না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এঁরা সব কোথায় ? পরেশ—বাঁড়ুয্যে মশাই ?'

কল্যাণী বললে, 'কেউ বাড়ীতে নেই।'

—'তা'ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু গেল কোথায় সব ?'

কল্যাণী একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ওদের কথা বাদ দাও। ওরা

আর বাড়ীতে থাকে কতক্ষণ। দিনরাত ঝগড়া মারামারি মামলা মকদ্দমা···এই সব নিয়েই আছে।'

—'আহা, ঝগড়া মারামারি, মামলা মকদ্দমা জমিদারী বজায় রাখতে গেলে এ সব তো থাকবেই। তা বলে এত রাত্রি— ?'

কথাটা বলতে কল্যাণী কুণ্ঠিত হচ্ছিল, তবু তাকে বলতে হোলো। কল্যাণী বললে, 'একটা বাগানের দখল নিয়ে জমিদারদের সঙ্গে দাঙ্গা বেধেছে। বাপ আর ছেলে দুজনে গেছে সেখানে।'

অতুল চিন্তিত কণ্ঠে বললে, 'না, না, এ ত ভাল কথা নয়—'

কল্যাণী বললে, 'ওঁরা এই-সবই ভালবাসেন। জমিদারের লোক এসেছিল বাগানের গাছ কেটে দখল নিতে। এখন বাপ-ব্যাটায় দুজনে লোক জন, পাইক পেয়াদা নিয়ে ছুটেছেন তাদের ঠেকাতে। একটু আগে খবর পেয়েছি দু' দলে রীতিমত দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে।'

অতুলের আর-কিছু জানবার দরকার ছিল না। সে উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি চললাম।'

বিস্মিত কল্যাণী বললে, 'কোথায়—?'

—'তোদের ওই বাগানে। মজবুত গোছের একটা লাঠি আমায় দিতে পারিস? লাঠি না হলেও চলবে, এক গাছা বাঁশ পেলেই ব্যাটাদের আমি তুলো ধুনে দিয়ে আসবো—'

কল্যাণী শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'না কাকাবাবু, তোমার যাওয়া হবে না। নতুন জমিদার ভারি বদলোক। দেড়শো' দুশো লোক পাঠিয়েছে বাগানের দখল নিতে—তুমি তাদের আটকাতে পারবে না।'

অতুল বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'খুব পারবো, খুব পারবো।

বাঁড়ুয্যে-মশাই আর পরেশ, আমাদের বেয়াই-মশাই আর জামাই, এদের বিপদের সময় আমি চুপ করে বসে থাকবো? তুই কিছু ভাবিস্‌নি কল্যাণী, আমি ব্যাটাদের শায়েস্তা করে ওদের দুজনকে নিয়ে এখুনি ফিরে আসছি—'

অতুলকে কিছুতেই রাখা গেল না। কোমরের কাপড়টা ভাল করে বাঁধতে বাঁধতে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

পথের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে অতুল যখন বাগানে পৌঁছল তখন মারামারি লাঠালাঠি একেবারে চরমে উঠেছে। চারিদিক অন্ধকার, মাঝে মাঝে দু'একটা মশালের আলো, তারি মধ্যে শুধু লোকজনের তর্জ্জন-গর্জ্জন আর লাঠিপড়ার শব্দ! সেই অন্ধকারের মধ্যেই অতুল অতি কষ্টে বটুককে খুঁজে বার করলে, কে কোন্ দলের লোক সেটা মোটামুটি জেনে নিয়েই মস্ত একটা বাঁশ-হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই দাঙ্গার মাঝখানে। বটুক বাঁড়ুয্যে একটা গরুর গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, অতুলকে বীরবিক্রমে এগোতে দেখে তিনি রীতিমত খুসী হয়ে উঠলেন; বেশ জোর গলায় উৎসাহ দিতে লাগলেন দলের লোকজনকে। অতুলকে দেখে পরেশ ভিড়ের ভেতর যেতে তাকে বারণ করলে, কিন্তু অতুল সে কথায় কাণ দিলে না।

লাঠিখেলার অভ্যাসটা অতুলের অনেক দিনের। তার হাতের বাঁশের বাড়ী খেয়ে জমিদার পক্ষের দুচারটে লোক রীতিমত জখম হলো। কিন্তু দলে তারা অনেক। শিবনাথ নানা জায়গা থেকে লোক আনিয়ে রীতিমত আয়োজন করে বটুক বাঁড়ুয্যের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করতে নেমেছিল।

শিবনাথের দলের দু'চারজন পর পর জখম হতেই তাদের সকলের দৃষ্টি পড়লো অতুলের ওপর। ওরা চারদিক থেকে ছুটে এসে অতুলকে প্রায় ঘিরে ফেললে। অতুলও সহজে হটবার পাত্র নয়, একাই সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলে না তাদের আটকাতে। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানীর লাঠি সজোরে মাথার ওপর পড়তেই সমস্ত দিনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও উত্তেজনায় অবসন্ন তার দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর, মাথা ফেটে দরদর করে রক্তের ধারা নেমে এলো।

হিন্দুস্থানী লাঠিয়ালটা বুদ্ধিমান। দলের আর-সবাইকে সে পরামর্শ দিলে অতুলের দেহটা তুলে নিয়ে একেবারে জমিদার-বাড়ীতে পৌছে দিতে। সেখানে জমিদারবাবু যে-রকম হুকুম দেবেন তারা তাই করবে।

কয়েকজন লোক অতুলের দেহটা তুলে নিয়ে জমিদার-বাড়ী রওনা হলো। বটুক বাঁড়ুয্যে তফাৎ থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পুলিসে খবর দিতে ছুটলো।

অতুলের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে কল্যাণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো, রাত গভীর হলো, গ্রামের পথে লোক চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল, তবু যখন অতুল, বটুক বা পরেশ কেউ-ই ফিরলো না, তখন কল্যাণী আর স্থির থাকতে পারলে না। বাড়ীর একজন ঝিকে সঙ্গে করে নিজেই সে বড়বাগানে গিয়ে হাজির হবে কি-না ভাবছিল এমন সময় একজন পাইক ছুটতে ছুটতে এসে কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবু কোথায় মা-ঠাকরুণ, দাদাবাবু কোথায়।'

লোকটার ভাবভঙ্গী দেখে কল্যাণী আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলো; উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হয়েছে শিগগির বল্।'

লোকটা বললে, 'একজন জখম হয়েছে মা,—খুব জোর জখম। জমিদারের লোকজন তাকে তুলে নিয়ে সরে পড়েছে। তাই বাবুকে—'

অতুল জখম হবার পর, বটুক পরেশকে নিয়ে নিঃশব্দে থানায় রওনা হয়েছিলেন, লোকটা তা লক্ষ্য করেনি।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলে, 'যে-লোকটা জখম হয়েছে তাকে চিনিস্ তোরা?' পাইক জবাব দিলে, 'না মা-ঠাকরুণ, নতুন লোক। ভদ্দর লোক, তবে আমাদের হয়ে যা লড়লে মা-ঠাকরুণ, সে তুমি নিজের চোখে না দেখলে পেত্যয় যাবেন না।'

কল্যাণীর আর-কিছু শোনার ধৈর্য্য ছিল না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে, লোকটি তার কাকা অতুল ছাড়া আর কেউ নয়। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে কল্যাণী বললে, 'আমি শিবনাথবাবুর বাড়ী যাব। তুই নিয়ে যেতে পারবি?' পাইকের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। সে বললে, পারবো না কেন মা-ঠাকরুণ? কিন্তু ওরা যে আমাদের শত্তুর, আপনি এত রাত্রে—'

—'তা হোক, আমাকে যেতেই হবে।'

কল্যাণী আলনা থেকে একটা চাদর পেড়ে নিয়ে কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে নিলে; তারপর বললে, 'আয় আমার সঙ্গে।'

অতুলের অচেতন দেহটা কাছারী-বাড়ীর একটা কুঠুরিতে রেখে শিবনাথের সর্দ্দার-পাইক উপরে ছুটলো খবর দিতে। শিবনাথ দাঙ্গার ফলাফল জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করছিল। পাইক সেলাম ঠুকে সামনে দাঁড়াতেই শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলে, 'খবর কি?'

সর্দ্দার-পাইক জবাব দিলে, 'খবর ভাল হুজুর। বটুকবাবুর লোকজন সব পালিয়েছে। খালি একটা লোক একদম জখম হয়ে গেছে।'

শিবনাথ একটু চিন্তিত হলো। জিজ্ঞাসা করলে, 'বাগানে ফেলে রেখে এসেছিস?' সর্দ্দার-পাইক বললে, 'না হুজুর। কাছারী-বাড়ীর—কুঠুরিতে এনে রেখেছি।'

শিবনাথ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে কি যেন ভাবলে; তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'লোকটার অবস্থা কি-রকম? মানুষ চিনতে পারছে?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে?'

'আজ্ঞে তাও বোধ হয় পারবে।'

'তোরা খুব বুদ্ধিমান দেখছি!'

শিবনাথ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করলে। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ। তারপর সর্দ্দার-পাইকের কাছে এসে কণ্ঠস্বর

একটু নিচু করে বললে, 'একেবারে খতম্ করে দিতে পারলি না, গাধা কোথাকার !'

শিবনাথের কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে লোকটার বেশী দেরি হোলো না। সে বললে, 'হুজুরের হুকুম হলেই—'

শিবনাথ বললে, 'একেবারে খতম করে দিয়ে লাস ফেলে দিয়ে আয় বাগানের ভেতর।'

পাইক আবার একটা সেলাম ঠুকে নিচে নেমে গেল।

শিবনাথ স্থির হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। বটুক বাঁড়ুয্যেকে সে ভাল করে জানে। এই লোকটা বেঁচে থাকলে তাকে সাক্ষী খাড়া করে শিবনাথকে সে অস্থির করে তুলবে। বাগানের দখল হয়ত শিবনাথ পাবে কিন্তু বটুক তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না এক মুহূর্ত্ত। অথচ এই বটুককে শায়েস্তা করবে বলেই অবিনাশবাবুর জমিদারীর শাসনভার সে নিজের হাতে নিয়েছে, অবিনাশবাবুর অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করেছে ভারতীকে বিবাহ করে। বটুক বাঁড়ুয্যে তার জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে—তারই জন্যে তাকে বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে জেলখানায়। কমলার মৃতদেহ ফেলে রেখে যেতে হয়েছে থানায়, চিরজীবনের মত হারাতে হয়েছে তার একমাত্র মেয়ে এবং একান্ত স্নেহশীল ছোট ভাইটিকে—না, বটুকের কাছে হেরে গেলে তার চলবে না। পাইক কতক্ষণে ফিরে এসে আহত লোকটাকে একেবারে খতম করে ফেলার খবর দেবে তারই জন্যে শিবনাথ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঘরে এসে ঢুকলো ভারতী।

'তুমি আমার সঙ্গে নিচে চলো।'

বন্দী

—'কেন ?'

—'পাইকরা কাছারী-বাড়ীর ঘরে কাকে যেন ধরে নিয়ে এসেছে। লোকটা কিরকম চীৎকার করছে দেখবে এসো।'

—'কোন দরকার নেই।'

— দরকার নেই কি বলছো ? লোকটাকে হয়ত' মেরেই ফেলবে।'

—'ফেলুক্। তোমার অত-সব জানবার দরকার নেই ভারতী।'

ভারতীকে কিছুতেই শান্ত করা গেল না। সে বললে, 'না, না, আমার বাড়ীতে এ রকম ক'রে কাউকে মারতে আমি দেবো না।'

ভারতী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। কিন্তু কাছারী বাড়ীতে পৌঁছবার আগেই সদর দরজায় কিসের যেন একটা কোলাহল উঠলো। ভারতী ছুটলো সেই দিকে। সদরে এসে দেখলে একটি মেয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভোজপুরী দারোয়ান তাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না।

ভারতী এগিয়ে এসে বললে, 'কি হয়েছে বলো তো ? কাকে খুঁজছো তুমি ?'

কল্যাণী জবাব দিলে, 'আপনাদের লোকজন আমার কাকাবাবুকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি তাঁর কাছে যেতে চাই। তিনি কোথায় ? কোথায় তিনি—?'

ভারতী কল্যাণীর হাত ধরে বললে, 'এসো আমাব সঙ্গে।'

কল্যাণীকে নিয়ে সে কাছারীবাড়ীর দিকে এগোল। ভোজপুরী দারোয়ান বিব্রত, বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

কাছারীবাড়ীর অর্দ্ধ অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে পাইক আর পেয়াদারা

মিলে অতুলকে ততক্ষণে একটা চেয়ারে বসিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। সর্দ্দার-পাইক ভোজালী বার করে অতুলের বুকে বিঁধিয়ে দেবার জন্যে তৈরী!

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো ভারতী, পিছনে পিছনে কল্যাণী!

ভারতী সর্দ্দার-পাইকের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ সবের মানে কি?'

সর্দ্দার হাত উঁচু করে সেলাম ঠুকে জবাব দিলে, 'বাবুর হুকুম।'

'বাবুর হুকুম!'—ভারতী আর কিছু বলবার আগেই কল্যাণী ছুটে গেল অতুলের কাছে। অতুলের মাথার ক্ষতস্থানে তখনও রক্তের ধারা নেমে আসছে।

কল্যাণী তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বললে, 'একি করেছে এরা তোমায়? কেন তুমি এখানে এসেছিলে কাকাবাবু, কেন তুমি……'

ভারতী অতুলের মুখের দিকে চেয়েছিল, তার মনে হচ্ছিল লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে। একটু চুপ করে থেকে সে কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইনি তোমার কাকা?'

কল্যাণী বললে, 'হ্যাঁ।—উনি কিছু জানেন না, আপনাদের এই ঝগড়া-ঝাঁটির সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই, উনি আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমায় দেখতে এসেছিলেন। ছেড়ে দিন, আপনারা ওঁকে ছেড়ে দিন—'

ভারতী কিছু বলবার আগেই ঘরে ঢুকল শিবনাথ। কিন্তু চেয়ারের উপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত ওই লোকটিকে দেখে বিস্ময়ে

তার হাত-পা যেন কাঠ হয়ে গেল। লোকটি যে অতুল সে-কথা বুঝতে তার মুহূর্ত্তের সময় লাগল না।

আচ্ছন্নের মত শিবনাথ শুধু উচ্চারণ করলে, 'অতুল!'

চেষ্টায় অতুলের বুক ফেটে যাচ্ছিল, তবু সে কোন রকমে ডাকলে, 'দাদা!'

শিবনাথ এগিয়ে গেল অতুলের কাছে। নিজের হাতে তার বাঁধন খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কি করে এদের মধ্যে এসে পড়লি অতুল? আমি যে—'

অতুল বললে, 'আমিও কি ছাই জানতাম—তুমি আছ এর মধ্যে! এসেছিলাম কল্যাণীকে দেখতে, ওই বটুকের ছেলের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়েছি দাদা—কল্যাণী, কল্যাণী তোমার মেয়ে—'

শিবনাথ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো কল্যাণীর মুখের দিকে তারপর দুহাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে।

অতুল বললে, 'তোমার জিনিস তুমি ফিরে নাও দাদা। এবার আমার ছুটি।'

কল্যাণী বললে, 'ইস্, তাই বইকি। আর তোমাকে এক দণ্ড কোথাও যেতে দেব না।'

শিবনাথ হাসতে হাসতে বললে, 'এবার পালাবার চেষ্টা করলে ওকে সত্যি সত্যি খুন করবো।'

অতুল হাসতে হাসতে বললে, 'খুন করতে কি আর বাকি রেখেছিলে নাকি! ভাগ্যিস্ বৌদি আর মেয়েটা এসে পড়লো! এখন এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি—'

ভারতী নিজে জল আনতে ছুটলো।

ঠিক সেই সময় বটুক এসে হাজির হ'লো গোটা-এই কনেষ্টবল আর পুলিসের দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শিবনাথের দিকে দারোগাবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটুক বললে, 'ওই যে ওই—ওই হলো আসল আসামী!'

অতুল হাসতে হাসতে বললে, 'আরে আসামী নয়, আসামী নয়। আপনার বেয়াই, কল্যাণীর বাবা—মানে আমার দাদা, আমার বড় ভাই।'

বটুক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শিবনাথ বললে, 'বসুন বেয়াই-মশায়, শেষ পর্য্যন্ত আপনার কাছেই আমাকে হার মানতে হলো।'

সমাপ্ত